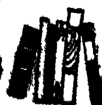
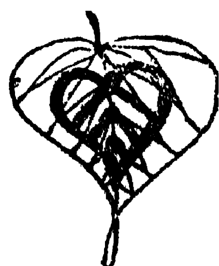
প্রথম সংস্করণ :
৭ই আশ্বিন,
১৮৭৭ শকাব্দ

প্রচ্ছদসজ্জা
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর : শ্রীননীমোহন সাহা,
রূপশ্রী প্রেস (প্রাঃ) লিঃ,
৯, এণ্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-৯







নিবেদন

উত্তরজীবনে আজ যিনি বিশ্ববিশ্রুত মনীষী, দার্শনিক ও মহাসাধকরূপে সর্বজনবরেণ্য হইয়াছেন আমার সেই পূজনীয় আচার্যদেবের প্রথমজীবনের রচনাবলীতে আমার একান্ত কৌতূহল ছিল। সেই কৌতূহলের সঙ্গে পরম বিস্ময়ের সঞ্চার হইল যখন জানিলাম যে তাঁহার সে-সব আদি রচনা প্রধানত তদানীন্তন বাংলা কাব্য, সাহিত্য ও দুই একজন তখনকার লোকপ্রিয় ইংরাজ কবিকে উপলক্ষ্য করিয়া রচিত। এখন নানা আগম-নিগম যোগাদি দর্শন-শাস্ত্রের অতল সাগরেই তাঁহাকে সর্বদা নিমগ্ন দেখি। তিনি যে কাব্যামৃতকেও 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর' বলিয়া মনে করেন তাহা আমার ধারণা ছিল না। তিনি যখন তাঁহার সারস্বত জীবনের উষাকালে রচিত এই প্রবন্ধগুলি আমার হাতে তুলিয়া দিলেন, তখন এগুলি পড়িতে পড়িতে উপলব্ধি করিলাম যে কাব্য বা সাহিত্য-সমালোচনার ছলে তিনি সেই অসীমেই উধাও হইয়াছেন যেখানে আজ তিনি স্বচ্ছন্দবিহারী। কবির কাব্য বা অন্যান্য সাহিত্য-রচনা তাঁহার কাছে আলম্বনমাত্র হইয়াছে বা উদ্দীপনবিভাবের কার্যমাত্র করিয়াছে। সেগুলির মাধ্যমে তাঁহার গভীর হৃদয়তলে যে আলোড়ন জাগিয়াছে তাহাই এই সমস্ত প্রবন্ধাবলীতে অপরূপভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পূজ্যপাদ আচার্যদেব যখন তাঁহার এই আদি জীবনের সুরক্ষিত মণিমঞ্জুষা আমাকে সমর্পণ করেন এবং তাহা একত্রে সংকলিত করিয়া প্রকাশের জন্য সানন্দ সম্মতি দান করেন তখন তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে তাহার মধ্যে দুই একটি অমূল্য নিধি সম্ভবত হারাইয়া গিয়াছে, তবে সেগুলির অনুলিপি তাঁহার কাছে না থাকিলেও কবে কোথায় প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা লেখা আছে। রচনাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন যে দুইটি রচনা ইংরাজ কবি বায়রন ও ব্রাউনিং অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল, সেই দুইটির মধ্যে প্রথমটি (বায়রন) ঢাকা হইতে প্রকাশিত "প্রতিভা" নামক পত্রিকায় ভাদ্র ১৩১৮ বঙ্গাব্দে এবং দ্বিতীয়টি (ব্রাউনিং) সুপ্রসিদ্ধ "প্রবাসী" পত্রিকাতে ঐ বৎসরেরই কিছু আগে পরে দুই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ দুইটির কোনো অনুলিপি আচার্যদেবের নিকট ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গীয় সাহিত্য

পরিষদের গ্রন্থাগারে সুরক্ষিত "প্রতিভা" ও "প্রবাসীর" প্রাচীন সংগ্রহ হইতে ঐ দুইটি প্রবন্ধের পুনরুদ্ধার সম্ভব হইয়াছে। এই পুনরুদ্ধার-কর্মে আমাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন উৎসাহী তরুণ বন্ধু শ্রীমান্ শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিষৎ কর্তৃপক্ষের সাগ্রহ আনুকূল্যের জন্য একান্ত ধন্যবাদ জানাই।

পুনরুদ্ধৃত ঐ দুইটি প্রবন্ধ-রচনার ইতিহাসও বড বিচিত্র। আচার্যদেবকে "ব্রাউনিং" শীর্ষক প্রবন্ধটি লেখার বিশিষ্ট প্রেরণা দেন আর এক শ্রুতকীর্তি মনীষী ও দার্শনিক, যাঁহার জন্মশতবার্ষিকী আমরা এই বৎসরে পালন করিলাম —আচার্য ৺ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। সেদিনের তরুণ বিদ্যার্থী ১৯১০ সালের জুন মাসে কলিকাতায় আচার্য শীলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান। তখনই তিনি তাঁহাকে ব্রাউনিং সম্বন্ধে নানা সমালোচনা-গ্রন্থাদি পড়িবার জন্য উৎসাহিত করেন। বায়রন সম্বন্ধে তিনি প্রেরণা পাইয়াছিলেন তাঁহার শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক স্বর্গীয় নবকৃষ্ণ রায়ের নিকট হইতে। ইনি আচার্যদেবের পঠদ্দশায় (১৯০৬-১৯১০ খ্রী) জয়পুর (রাজস্থান) মহারাজ কলেজের ইংরাজির অধ্যাপক ছিলেন। ব্রাউনিং ও বায়রনের কাব্য-সুষমার প্রতি এই দুইজন মনীষীই তাঁহাকে আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ করেন, এ কথা আজও আচার্যদেব কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের 'সাগর-সঙ্গীত' আচার্যদেবের হৃদয়তটে যে আনন্দ-স্পন্দন জাগাইয়া তুলিয়াছিল তাহাই সমালোচনার আকারে তৎকালীন "অলকা" নামক পত্রিকায় (১৩২৯ বঙ্গাব্দে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ইহারও পূর্বে সেকালের যশস্বিনী লেখিকা 'বসন্ত-প্রয়াণ' রচয়িত্রী সরযূবালা দেবীর 'ত্রিবেণীসঙ্গম' গ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি বিশেষ মুগ্ধ হ'ন এবং কয়টি প্রবন্ধে ইহার মূল বক্তব্যের অভিনবত্ব পরিস্ফুট করেন। এগুলি "প্রবাসজ্যোতি" নামক পত্রিকায় ১৩২৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতি আচার্যদেবের চিরদিনই গভীর শ্রদ্ধা। তাঁহার রচনাবলী অবলম্বনে কিছু লেখার অভিলাষও তাঁহার বহুদিনের। কিন্তু সে-অভিলাষ পূর্ণ করার সুযোগ তাঁহার নানা কর্মব্যস্ততায় ঘটিয়া উঠে নাই। অবশেষে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে কাশী হইতে প্রকাশিত প্রখ্যাত "উত্তরা" পত্রিকার দুইটি সংখ্যায় সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর অনুরোধে তিনি 'বলাকা' সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করেন। যদিও এ লেখাটি অসম্পূর্ণই

রহিয়া গিয়াছে, তবু ইহা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই কবিগুরুর সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং তিনি ইহা পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন ও আচার্যদেব আরও আলোচনা করিবেন বলিয়া একান্ত আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই লেখাটি পরে ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঐ পত্রিকাতেই পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই সংকলনের প্রথম প্রবন্ধটি 'রস ও সৌন্দর্য' আচার্যদেব যখন কাশীর কুইন্‌স্ কলেজে কর্মরত ছিলেন তখন রসশাস্ত্র লইয়া আলোচনা-প্রসঙ্গে মনে যে ভাবনারাশি ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহারই ফলস্বরূপ। আমরা সাহিত্যালোচনার পটভূমিরূপে এই রস ও সৌন্দর্যবিষয়ক আলোচনাটি প্রথমেই সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

সাহিত্যবিষয়ক এই কয়টিমাত্র রচনা একত্রে সংকলিত করিয়া প্রকাশ করা হইল। বাংলার সাহিত্য-রসিকগণ এই সামান্য গ্রন্থে যুগপৎ বিগত যুগের সাহিত্য-চিন্তার ধারা ও আচার্যদেবের অসামান্য সাহিত্য-মননের পরিচয় পাইবেন আশা করি। ইণ্ডিয়ান্ অ্যাসোসিয়েটেড্ পাব্লিশিং কোং প্রাইভেট্ লিমিটেডের বন্ধুবর শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সাগ্রহে এই গ্রন্থটি প্রকাশের ভার লইয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

রস ও সৌন্দর্য

সৌন্দর্যের কথা বলিতে গেলেই পূর্বে রসের কথা বলা আবশ্যক। জগৎটা রসের জন্য পাগল। কিসে রস পাইবে, কোথায় রস আছে, তাহার সন্ধান কেহ জানে না, তবু সকলেই রস চায়। মধুকর গুঞ্জন করিতে করিতে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ভ্রমণ করে, সেও রসেরই আকাঙ্ক্ষায়, যোগী যোগমগ্ন, ভোগী ভোগবিলাসে বিভোর, স্ত্রীকে ভালবাসি, পুত্রকে ভালবাসি, যেখানে সৌন্দর্য দেখি, সেখানে ছুটিয়া যাই—সবই রসের পিপাসায়,—রসের লোভে সকলেই চঞ্চল। রস ভিন্ন প্রাণী বাঁচিতে পারে না। "কো হ্যন্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদ্যেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ"। রসই সার—রসই সত্ত্ব।

যাহার আস্বাদন হয় নাই, তাহার জন্য আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে না। রসের জন্য জগৎ পাগল, সুতরাং তাহার অনুভূতি একদিন কোথাও অবশ্যই হইয়াছে। নিশ্চয়ই একদিন সমস্ত জগৎ সেই রসপানে মাতোয়ারা হইয়া আত্মহারা হইয়াছিল, পরে নিয়তির প্রেরণায় সে অবস্থা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। যোগ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া জগৎ আজ তাহারই পুনঃপ্রাপ্তির আশায় মণিহারা ফণীর ন্যায় অশান্তভাবে ছুটিতেছে। যতদিন পুনরায় সেই যোগস্থাপনা না হইবে ততদিন এ অশান্তি ঘুচিবার সম্ভাবনা নাই।

যে বস্তুর স্বাদ যে পায় নাই, তাহার জন্য তাহার আকাঙ্ক্ষা হয় না। কিন্তু রসের স্বাদ আমরা কবে পাইলাম, কোথায় ও কিভাবে পাইলাম? কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, এ প্রশ্নের বিশেষ কোনই সার্থকতা নাই। কারণ, জীবনের অতীত অধ্যায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, রসানুভূতি সকলেরই কখনও না কখনও অল্পবিস্তর অবশ্যই হইয়াছে। ভাল লাগা, সুন্দর বোধ হওয়া, আনন্দ অনুভব করা—ইহা কাহারও কখন ঘটে নাই, এমন বলা যায় না। সুতরাং রসের জন্য আকাঙ্ক্ষা হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। কিন্তু এ উত্তর সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। তাহার প্রধান কারণ এই যে, যাহা চাই আর যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহা সজাতীয় নহে। আস্বাদন করিয়াছি বেদানা, অথচ চাহিতেছি আঙ্গুর—এমনটা হইতে পারে না। যে রস অনুভব করিয়াছি তাহা পরিচ্ছিন্ন, ঐকদেশিক, ক্ষণিক, মলিন—

কিন্তু যাহা চাই তাহা ইহার বিপরীত। যদি পূর্ণ আনন্দ, পূর্ণ সৌন্দর্য, পূর্ণ প্রেম কখনও আস্বাদন না করিয়া থাকি, তবে উহার জন্য তৃষ্ণা জাগে কেন? যে পরম সৌন্দর্য পশ্চাতে থাকিয়া এই তৃষ্ণার উদ্দীপন করিয়াছে, তাহাকেই আবার সম্মুখে উপলব্ধি না করিলে ইহার নিবৃত্তি হইবে না। সংসারে আনন্দ যতই পাই, সৌন্দর্য যতই দেখি, ততই প্রাণে অভাববোধ আরও বেশী করিয়া ফুটিয়া উঠে। দেখিযাও দেখিবার সাধ কিছুতেই মিটে না, মনে হয় ইহা অপূর্ণ। যখনই অপূর্ণ বলিয়া বুঝি, তখনই সীমা চোখে পড়ে, তখনই অজ্ঞাতসারে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। মনে হয় আরও—আরও এগিয়ে যাই, হয়ত সুদূর ভবিষ্যতে কোন একদিন তাহাকে ধরিতে পারিব। কিন্তু হায় মোহ! বুঝিতে পারি না যে কালপ্রবাহে এ আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হইতে পারে না। আনন্দ যতই বাড়ুক, সৌন্দর্য যতই উজ্জ্বল হউক, তৃপ্তি তবুও সুদূরপরাহত, কারণ আরও বিকাশ সম্ভবপর এবং কখনই এই ক্রমবিকাশের সম্ভাবনীয়তা দূর হইবে না। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, হৃদয় যাহা আকাঙ্ক্ষা করে, তাহা সসীম সৌন্দর্য কিংবা পরিমিত আনন্দ নহে। যদি হইত, তাহা হইলে একদিন না একদিন ক্রমবিকাশের ফলে তাহার তৃপ্তি হইত। বস্তুতঃ ইহা অসীম সৌন্দর্য, অনন্ত প্রেম, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। পূর্ণ সৌন্দর্যের সম্ভোগ হইয়াছে বলিয়াই পূর্ণ সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা হয়, বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্যে তৃষ্ণা মিটে না। যাহা হইতে বিরহ, তাহাকে না পাইলে ব্যাকুলতার অবসান সম্ভবপর নহে।

সুতরাং প্রশ্ন রহিয়া গেল—এ পূর্ণ সৌন্দর্য কবে আমি পাইয়াছিলাম এবং কোথায় পাইয়াছিলাম? আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, কালক্রমে এই পূর্ণ সৌন্দর্য আমি পাইতে পারি না; কোটীকল্পেও আমি এমন সৌন্দর্য পাইব না যাহার পরে আর সৌন্দর্য হইতে পারে না, অর্থাৎ কালের মধ্যে পূর্ণ সৌন্দর্যের বিকাশ হয় না—কালে যে বিকাশ হয়, তাহা ক্রমবিকাশ। এই ক্রমের অবসান নাই। আরও বেশী, আরও বেশী হইতে থাকে—কিন্তু কখনই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। যদি ইহা সত্য হয়, তবে ইহাও সত্য যে, কালে কখনই ইহার অনুভূতিও হয় নাই। অর্থাৎ আমি যে পূর্ণ সৌন্দর্যের অনুভূতি করিয়াছি, তাহা কোন সুদূর অতীতে নহে, কোন দিগন্তস্থিত নক্ষত্রমধ্যে নহে, কোন বিশিষ্ট কাল বা দেশে নহে।

অতএব এক হিসাবে এই প্রশ্নই অনুপপন্ন। কিন্তু ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রশ্ন

তবুও থাকে। পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও ইহা সত্য যে, এই সৌন্দর্যের আস্বাদন যখন আমি করিয়াছিলাম, তখন কাল ছিল না—যেখানে করিয়াছিলাম সেখানে দেশ ছিল না। সেটা আমার 'যোগ' অবস্থা বা মিলন। তারপর বর্তমানাবস্থা 'যোগভ্রংশ' বা বিরহ। আবার সেই যোগে ফিরিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি, পুনর্মিলন চাই। অর্থাৎ দেশকালে নির্বাসিত হইয়াছি, পুনরায় দেশকাল ভাঙ্গিয়া—বিলীন করিয়া, তদ্রূপ যোগযুক্ত হইতে ইচ্ছা করি।

কিন্তু এই বিয়োগ কি নিতান্তই বিয়োগ? পূর্ণের সঙ্গে বিচ্ছেদ কি সত্যই এত বাস্তব? তাহা নহে। বিয়োগ সত্য, বিচ্ছেদ স্বীকার্য—কিন্তু সে বিয়োগের মূলেও নিত্য যোগটি হারায় নাই, তাহা কখনও হারায় না। যদি হারাইত, তাহা হইলে এ বিয়োগ চিরবিয়োগ হইত, আর ফিরিবার সম্ভাবনা থাকিত না।

ঐ যে আকাঙ্ক্ষা, ঐ যে সসীম অতৃপ্তি, উহা বলিয়া দিতেছে, অসীমের সঙ্গে যোগ একেবারে হারায় নাই। স্মৃতি আছে—তাই যোগ আছে। এই যোগ, এই অনুভূতি—অস্পষ্ট, স্বীকার করি, কিন্তু ইহা আছে।

যদি এ অনুভূতি,—যদি পূর্ণের এই আস্বাদন না থাকিত, তাহা হইলে সৌন্দর্যের কোন মানদণ্ড থাকিত না। মান ব্যতিরেকে তুলনা সম্ভবপর হইত না। যখন দুইটী বিকশিত পুষ্প দেখিয়া কোন সময়ে একটিকে দ্বিতীয়টি অপেক্ষা সুন্দর মনে করি, তখন অজ্ঞাতসারে সৌন্দর্যের মানদণ্ডের প্রয়োগ করিয়া থাকি। যেখানে তারতম্যবোধ—সেখানে নিশ্চয়ই মানের ন্যূনাধিক্য-নির্ণায়ক উপাধি আছে। প্রকৃতস্থলে চিত্তস্থ পূর্ণসৌন্দর্যের অস্পষ্টানুভূতি বা অনুভবাভাসই বাহ্যসৌন্দর্যের তারতম্যবোধের নিমিত্ত। অর্থাৎ বাহিরের বস্তু দেখিয়া তাহাদের মধ্যে যাহা পূর্ণ সৌন্দর্যের যত অধিক সন্নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা তত সুন্দর মনে হয়। সৌন্দর্যের বিকাশ যেমন ক্রমিক, এই সন্নিকর্ষও তেমনই ক্রমিক। বাহিরে যেমন পূর্ণ বিকশিত সৌন্দর্য কখনই সম্ভবপর নহে, সেইরূপ এই সন্নিকর্ষের চরমাবস্থা অর্থাৎ একীভাবও সম্ভবপর নহে।

দেশ ও কালে যখন পূর্ণ সৌন্দর্য পাওয়া যায় না এবং বৃত্তিজ্ঞান যখন দেশ ও কালের সীমায় আবদ্ধ, তখন পূর্ণ সৌন্দর্য যে বৃত্তির কাছে প্রকাশ পায় ,না

ইহা সত্য কথা। বরং বৃত্তি পূর্ণসৌন্দর্যের প্রতিবন্ধক। সৌন্দর্যের যাহা পূর্ণাস্বাদ—বৃত্তিরূপে তাহাই বিভক্ত হইয়া যায়। বৃত্তিতে যে সৌন্দর্য বোধ হয়, তাহা খণ্ড সৌন্দর্য, পরিচ্ছিন্ন আনন্দ। পূর্ণ সৌন্দর্য নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে, তাহাকে অন্য কেহ প্রকাশ করিতে পারে না। বৃত্তিদ্বারা যে সৌন্দর্যের আভাস ফোটে—তাহা সাপেক্ষ, পরতন্ত্র, ক্রমবৃদ্ধিশীল, কালান্তর্গত। পূর্ণ সৌন্দর্য ইহার বিপরীত। এই পূর্ণ সৌন্দর্যের ছায়া ধরিয়াই খণ্ড সৌন্দর্যের আত্মপ্রকাশ।

তবে কি পূর্ণ সৌন্দর্য ও খণ্ড সৌন্দর্য দুইটি পৃথক বস্তু? তাহা নহে। উভয়ই বস্তুতঃ এক। তবে এই বিয়োগাবস্থায় দুইটিকে ঠিক এক বলা সম্ভবপর নহে। মনে হয় দুইটি পৃথক্। এই যে দুইএর অনুভব, ইহারই মধ্যে বিয়োগের ব্যথা লুক্কায়িত রহিয়াছে। ইহাকে জোর করিয়া এক করা যায় না।

কিন্তু তবু সত্য কথা এই যে উভয়ই এক। যে সৌন্দর্য বাহিরে তাহাই অন্তরে, যাহা খণ্ড সৌন্দর্য হইয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বারে বৃত্তিরূপে বিরাজমান, তাহাই পূর্ণ সৌন্দর্যরূপে অতীন্দ্রিয়ভাবে নিত্য প্রকাশমান। গোলাপের যে সৌন্দর্য তাহাও সেই পূর্ণ সৌন্দর্য, শিশুর ফুল্ল মুখকমলে যে শোভা তাহাও সেই পূর্ণ সৌন্দর্য—যে যখন এবং যেখানে যেভাবে যে কোনপ্রকার সৌন্দর্য বোধ করিয়াছে, তাহাও সেই পূর্ণ সৌন্দর্যই।

প্রশ্ন হইতে পারে সবই যদি পূর্ণ সৌন্দর্য এবং পূর্ণ সৌন্দর্য যদি সকলেরই আস্বাদিত ও আস্বাদ্যমান, তাহা হইলে আবার সৌন্দর্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা হয় কেন? কথা এই, পূর্ণ সৌন্দর্যবোধ অস্পষ্টরূপে সকলেরই আছে। কিন্তু অস্পষ্টতাই অতৃপ্তির হেতু। এই অস্পষ্টকে স্পষ্ট করিতেই ত সকলে চায়। যাহা ছায়া তাহাকে কায়া দিতে ইচ্ছা হয়। বৃত্তিদ্বারা এই অস্পষ্টের স্পষ্টীকরণ হয়, যাহা আবছায়ার মতন ছিল, তাহা যেন স্পষ্টভাবে ভাসিয়া উঠে। ভাসিয়া উঠে, কিন্তু খণ্ডভাবে। তাই বৃত্তিসাহায্যে স্পষ্ট সৌন্দর্যের সাক্ষাৎকার হইলেও, খণ্ড বলিয়া সসীম বলিয়া তৃপ্তি পরিপূর্ণ হয় না। বৃত্তি ত অখণ্ড সৌন্দর্যকে ধরিতে পারে না। অখণ্ড সৌন্দর্যের প্রকাশে বৃত্তি স্তম্ভিত হয়।

কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। মনে করুন, একটি ফুটন্ত গোলাপ আমার দৃষ্টির সম্মুখে রহিয়াছে। ইহার সৌন্দর্য আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছে—

ইহাকে সুন্দর বলিয়া আমি অনুভব করিতেছি। এই অনুভবকে বিশ্লেষণ করিলে আমি কি পাই? এ সৌন্দর্য কোথায়? ইহা কি গোলাপে, অথবা আমাতে, অথবা উভয়ে? এ অনুভবের স্বরূপ কি?

আপাততঃ ইহাই মনে হয় যে, ইহা শুদ্ধ গোলাপে নহে। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে সকলেই গোলাপটিকে সুন্দর দেখিত। কিন্তু তাহা দেখে না। আবার ইহা শুদ্ধ আমাতে অর্থাৎ দ্রষ্টাতেই আছে, ইহা বলাও ঠিক নহে। তাহা হইলে আমি সব জিনিষই সুন্দর দেখিতাম, কিন্তু তাহা দেখি না। সুতরাং বুঝা যাইবে যে, এই অনুভবের বিশ্লেষণ হইতে সিদ্ধান্ত হয় যে, বর্তমান ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যখন বৃত্তিদ্বারা বোধ হইতেছে, তখন সৌন্দর্য খণ্ডিতবৎ হইয়াছে, একদিকে অস্পষ্ট অথচ পূর্ণ সৌন্দর্য যাহা আমাতে আছে, অপরদিকে স্পষ্ট অথচ খণ্ড সৌন্দর্য যাহা গোলাপে দেখিতেছি। কিন্তু যথার্থ রসস্ফূর্তি কালে এরূপ থাকে না। তখন সৌন্দর্য আমাতে নাই, গোলাপেও নাই। আমি ও গোলাপ তখন একরস, সাম্যাবস্থাপন্ন—শুধু সৌন্দর্যই, স্বপ্রকাশমান সৌন্দর্যই তখন আছে। ইহাই পূর্ণ-সৌন্দর্য, যাহাতে ভোক্তা ও ভোগ্য উভয়েই নিত্যসম্ভোগরূপে বিরাজমান আছে।

বৃত্তিদ্বারা সৌন্দর্যোপলব্ধি কাহাকে বলে? যখন কোন বিশিষ্ট বস্তু প্রত্যক্ষ করি, তখন অল্পবিস্তর ঐ বস্তু আমার চিত্তস্থ আবরণকে আঘাত দিয়া দূরীকৃত করে। চিত্ত পূর্ণ সৌন্দর্যাবভাসময়, কিন্তু এ অবভাস আবরণে ঢাকা বলিয়া অস্পষ্ট। কিন্তু একেবারে ঢাকা নহে, হইতে পারে না। মেঘ সূর্যকে ঢাকে, কিন্তু একেবারে ঢাকিতে পারে না। যদি ঢাকিত, তাহা হইলে মেঘ স্বয়ংও প্রকাশিত হইত না। মেঘ যে মেঘ তাহাও সে প্রকাশমান বলিয়া, সুতরাং সূর্যালোকসাপেক্ষ। সেই প্রকার আবরণ চিত্তকে একেবারে ঢাকিতে পারে না। চিত্তকে ঢাকে, কিন্তু আবরণ ভেদ করিয়াও জ্যোতিঃস্ফুরণ হয়। তাই পূর্ণ সৌন্দর্য আবরণের প্রভাবে অস্পষ্ট হইলেও একেবারে অপ্রকাশমান নহে। যেখানে চিত্ত আছে, সেইখানেই একথা প্রযোজ্য। তবে অস্পষ্টতার তারতম্য আছে মাত্র। এই যে আবরণের জন্য অস্পষ্টতা, আবরণের বিনাশে তাহাও স্পষ্টতায় পরিণত হয়। কিঞ্চিদাবরণ অপসারিত হইলে যে স্পষ্টতা জাগে তাহাও কিঞ্চিন্মাত্র। গৃহচ্ছিদ্র হইতে অনন্ত আকাশের যেমন একদেশ-মাত্র দৃষ্টিগোচর হয়, আংশিকভাবে আবরণভঙ্গবশতঃ সেইপ্রকার পূর্ণ

সৌন্দর্যের একদেশমাত্রই প্রকাশ পায়। এই প্রকাশমান একদেশই খণ্ড সৌন্দর্য বলিয়া পরিচিত। এই আংশিক আবরণভঙ্গই বৃত্তিজ্ঞান। সুতরাং যাহা গোলাপের সৌন্দর্য তাহাও পূর্ণ সৌন্দর্যই, তবে একদেশ মাত্র। এইরূপ জগতের যাবতীয় সৌন্দর্যই সেই পূর্ণ সৌন্দর্যের একদেশ। আবরণভঙ্গের তারতম্যবশতঃ উদ্ঘাটিত সৌন্দর্যের তারতম্য অথবা বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয়।

কিন্তু আবরণভঙ্গের বৈশিষ্ট্যনিয়ামক কে? আপাততঃ ইহা বাহ্যপদার্থের স্বরূপনিষ্ঠ বৈশিষ্ট্য বলিয়াই ধরিতে হইবে। কিন্তু আমরা পরে দেখিব যে, ইহাই চরম কথা নহে। সুতরাং আবরণভঙ্গের ভেদ যে স্বাভাবিক, তাহা এই অবস্থায় বলা চলে না। আপাততঃ বলিতেই হইবে যে আগন্তুক কারণের বৈচিত্র্যবশতঃ আবরণাপগমেও বৈচিত্র্য সংঘটিত হয়। স্ফটিকসন্নিধানে নীল-বর্ণের স্থিতিতে স্ফটিক নীলাভাস হয়, পীতবর্ণে পীতাভাস হয়—ইহা আগন্তুক কারণজন্য ভেদের দৃষ্টান্ত; চক্ষুসন্নিকৃষ্ট ঘট হইতে ঘটাকার বৃত্তি এবং পট হইতে পটাকার বৃত্তি চিত্ত ধারণ করে, ইহাও আগন্তুক ভেদ। ঠিক সেইপ্রকার ফুলের সৌন্দর্য ও লতার সৌন্দর্য উভয়ের অনুভবগত ভেদ বুঝিতে হইবে। ফুলের সৌন্দর্যাস্বাদ যে বৃত্তি, লতার সৌন্দর্যাস্বাদ তাহা হইতে বিলক্ষণ বৃত্তি, ইহার কারণ আগন্তুক। ফুল ও লতার বৈশিষ্ট্য যেমন সত্তাগত, সেইরূপ জ্ঞানগতও বটে, আবার আস্বাদনগতও বটে। কাজেই স্বীকার করিতে হইবে, ফুল এবং লতাতে এমন বিশিষ্ট কিছু আছে, যাহাতে একটি একপ্রকার সৌন্দর্যানুভূতির উদ্দীপক, অপরটি অপরপ্রকার।

কিন্তু ইহা আপেক্ষিক সত্য। বাহ্য পদার্থ যদি পরমার্থতঃ না থাকে, অথবা যে অবস্থায় না থাকে, তখন অথবা সেখানে বাহ্য পদার্থের স্বরূপগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা রসানুভূতির বৈচিত্র্য উপপাদন করা যায় না। সত্তা যেমন এক ও অখণ্ড হইলেও ফুল ও লতা খণ্ডসত্তা, জ্ঞান যেমন এক ও অখণ্ড হইলেও ফুলের জ্ঞান ও লতার জ্ঞান অর্থাৎ ফুলরূপ জ্ঞান ও লতারূপ জ্ঞান পরস্পর বিলক্ষণ, সেই-প্রকার সৌন্দর্য এক ও অখণ্ড হইলেও ফুলের সৌন্দর্য ও লতার সৌন্দর্য অর্থাৎ ফুলরূপ সৌন্দর্য ও লতারূপ সৌন্দর্য পরস্পর ভিন্ন। এ জগতে দুইটি বস্তু ঠিক এক নাই, প্রত্যেক বস্তুরই একটি স্ব-ভাব আছে, একটি ব্যক্তিত্ব আছে, একটি বিশিষ্টতা আছে, যাহা দ্বিতীয় বস্তুতে নাই। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা

হইলে খণ্ড সত্তা যেমন অনন্ত, সংখ্যায় এবং প্রকারে, খণ্ডজ্ঞানও সেইরূপ, খণ্ড সৌন্দর্যও সেইরূপ। কিন্তু যাহা সত্তা তাহাই ত জ্ঞান, কারণ প্রকাশমান সত্তাই জ্ঞান ও অপ্রকাশমান সত্তা অলীক। আর যাহা জ্ঞান তাহাইত আনন্দ, কারণ অনুকূল জ্ঞানই বা ভাল লাগাই আনন্দ বা সৌন্দর্যবোধ, আর প্রতিকূল জ্ঞানই দুঃখ বা কদর্যতা। সত্তা যখন জ্ঞান তখন তাহা নিত্যজ্ঞান, আর জ্ঞান যখন আনন্দ, তখন নিত্যসংবেদ্যমান আনন্দ। এই নিত্যসংবেদ্যমান আনন্দই রস। সুতরাং রসের সদাকালীন অভিন্নভাবে আস্বাদনই অখণ্ড বা পূর্ণানুভূতির স্বরূপ; ইহা বৃত্তি নহে, রসস্ফূর্তি।

সুতরাং রস পদার্থে সত্তা ও জ্ঞানের অন্তর্নিবেশ আছে। রস হইতে সত্তা ও জ্ঞানের বস্তুতঃ পার্থক্য নাই। অতএব রস এক হইয়াও অনন্ত, সামান্য হইয়াও বিশেষ। একটি বিশিষ্ট রসস্ফূর্তি ফুল, আর একটি বিশিষ্ট রসস্ফূর্তি লতা—উভয়ের আস্বাদনগত ভেদ আছে। তাই জগৎ কাহারও অভাব সহ্য করিতে পারে না, একের অভাব অন্যে পূর্ণ করিতে পারে না। প্রতিবস্তুর মর্যাদা আছে, যাহা অলঙ্ঘনীয়।

বুঝা গেল, পূর্ণ সৌন্দর্যই খণ্ড সৌন্দর্য। কিন্তু খণ্ড সৌন্দর্য যখন বৃত্তিতে প্রকাশমান, তখন উহা রসবিশেষ নহে, রসাভাস মাত্র। এই রসাভাস বিক্ষিপ্ত বৃত্তির নিরোধবশতঃ যথার্থ রসে পরিণত হয়, যাহাকে ecstatic অথবা æsthetic intuition বলা যাইতে পারে।

এই যে রসবিশেষ—ইহা অনন্ত, কারণ প্রতিব্যক্তিতে স্ফুরণের ও আস্বাদনের বৈশিষ্ট্য আছে। তবে যে আলঙ্কারিকগণ ইহাকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন, সে কেবল জাতিগত ভেদ লক্ষ্য করিয়া, শাস্ত্রীয় ব্যবহারের সৌন্দর্যনিমিত্ত। মধুর স্বাদ ও গুড়ের স্বাদ একপ্রকার নহে, আবার মধুর স্বাদ ও লবণের স্বাদও একপ্রকার নহে। তথাপি যেকারণে মধু ও গুড়কে এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়, মধু ও লবণকে করা হয় না; সেইকারণেই আলঙ্কারিকগণ রসকে শ্রেণীবিভক্ত করিয়াছেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে, মধু ও গুড় প্রয়োজনবশতঃ একজাতির অন্তর্গত হইলেও, বস্তুতঃ উভয়ের যেমন আস্বাদগত বৈচিত্র্য আছে, সেইরূপ একটি রস অপর একটি রসের সহিত একশ্রেণীভুক্ত হইলেও (যথা শৃঙ্গার) ঠিক এক নহে। সত্তা ও জ্ঞানের বৈচিত্র্যে যদি কোন সার্থকতা থাকে, রসেতেও তাহা আছে।

সুতরাং, এক হিসাবে রস অনন্ত, অপর হিসাবে নির্দিষ্টসংখ্যক। অথচ মূলে রস একই।

এই নির্দিষ্ট সংখ্যা কত সে বিচার এখানে তুলিবার প্রয়োজন নাই। আমরা শুধু গোড়াকার কথা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। এই যে অনন্ত রস বলিলাম, ইহার প্রত্যেকটির অবস্থাগত ভেদ সম্ভবপর। এই ভেদ স্থূলতঃ শুদ্ধ ও মলিন বলিয়া দ্বিবিধ। ইহা বাহ্যদৃষ্টিতে অর্থাৎ প্রত্যেকটি রস শুদ্ধভাবে স্বপ্রকাশ, তখনই যথার্থতঃ তাহা রসপদবাচ্য; আর মলিন হইলেই তাহা মিশ্রিত হইয়া যায় বলিয়া প্রকৃত রস নহে, রসাভাস। এই যে এক একটি শুদ্ধ স্বপ্রকাশ রসাস্বাদ তাহারও আবার দুইটি অবস্থা আছে। এক অবস্থা চিরস্থির, তাহাতে প্রবেশ করিলে আর নামিতে হয় না; দ্বিতীয় অবস্থা স্থির হইলেও কালাবচ্ছিন্ন, সেখান হইতে ব্যুত্থানসংস্কারের প্রবলতায় নামিয়া পড়িতে হয়। উভয়ই স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল, বস্তুতঃ উভয়ই এক। তবে একটি চাঞ্চল্য কিম্বা মালিন্যের সম্ভাবনাবিরহিত, আর একটিতে সে সম্ভাবনা আছে। একটিতে ব্যুত্থান-সংস্কার এবং নিরোধসংস্কার নাই অথবা চির-নিদ্রিত, আর একটিতে উহা আছে। কিন্তু আস্বাদনের কোন তারতম্য নাই।

অতএব যখন একটি খণ্ড সৌন্দর্য দেখিয়া আমরা সম্ভোগ করি, তখন প্রথমতঃ উহা বিক্ষিপ্তবৃত্তির আস্বাদন। উহা একটি বিশিষ্ট (unique) সৌন্দর্যেরই আস্বাদন বটে, কিন্তু সে আস্বাদন নির্মল নহে, সুতরাং গভীর নহে। সে আস্বাদনে আত্মহারা হই না। ক্রমে যখন বৃত্তি স্থির হইয়া আসিতে থাকে, অর্থাৎ যখন বৃত্তি আপন ক্ষেত্র হইতে বিষয়ান্তরকে ডুবাইয়া দেয় বা সরাইয়া দেয়, কেবল সেই একটি মাত্র খণ্ড সৌন্দর্যকেই প্রকাশ করে, অর্থাৎ বৃত্তি যখন যাবতীয় বিষয়কে সেই একটি সৌন্দর্যে আহুতি দিয়া, সেই একটিকে লইয়া মাখামাখি করিয়া প্রকাশ পায়, তখনকার আস্বাদন কিছু নূতন আস্বাদন নহে। উহা সেই বিক্ষিপ্ত অবস্থার আস্বাদনই বটে; উভয়ে qualitative কোন ভেদ নাই, তবে উহা এখন নির্মল এবং সেইজন্য অতি গভীর। ইহাই একাগ্রভূমির প্রজ্ঞা। এখানে রসস্ফুরণ হয়—রসসামান্যের কোলে একটি বিশিষ্ট রসব্যক্তি প্রকাশ পায়। এ অবস্থায় সেই খণ্ড সৌন্দর্যই আপন আলোকে আপনি প্রকাশ পায়। ভোক্তা ও ভোগ্য যেন স্ব-সংবেদ্যমান সম্ভোগ মধ্যে একাকার হইয়া স্থিতিলাভ করে।

কিন্তু এ অবস্থায় চিরকাল স্থিতি হয় না। ভাবের ঘোর কাটিয়া গেলেই পূর্বাবস্থা ফিরিয়া আসে,—যোগের পর আবার বিয়োগ আসে, মিলনের অবসানে বিরহ জাগে। কিন্তু যে কারণে এই যোগ ভাঙ্গিয়া যায় তাহা যোগাবস্থায়ও অব্যক্তভাবে বর্তমান থাকে। মিলনের কোলে বিরহ এইভাবেই লুকাইয়া থাকে। "দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া"। ইহাকে সংস্কার বলি আর যাহাই বলি তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু যদি এ সংস্কার কাটিয়া যায়, তাহা হইলে সে যোগ আর ভাঙ্গে না।

সুতরাং বিশিষ্ট রসস্ফূর্তির শুদ্ধাবস্থাও কালাতীত ও কালাবচ্ছিন্ন ভেদে দ্বিবিধ। যে উপায়ে কালকে অতিক্রম করা যায়, সদাকালীন স্থিতিলাভ করা যায়, সে উপায় ফলবান্ হইলেই ঐ বিশিষ্ট নির্মল রসাস্বাদও অবাধিত থাকিবে। কিন্তু সে আলোচনার ইহা স্থান নহে। তবে রসসামান্য রসবিশেষের বাধক নহে, ইহা আমরা পরে বলিব। কারণ, সামান্য বিশেষের বিরুদ্ধ নহে,—বিশেষেও সামান্য অনুস্যূত আছে।

এইখানে একটি কথার মীমাংসা করা আবশ্যক মনে করি। কেহ কেহ বলিতে পারেন, রসে বিশিষ্টতা আরোপিত ভেদ, স্বগত নহে। রস একই, কেবল উপাধিভেদে তাহাতে আগন্তুক ভেদের অবভাস হয়। আমরা মনে করি, ইহা যথার্থ সিদ্ধান্ত নহে। রস যে এক তাহা সত্য কথা, তাহাতে সজাতীয় কিংবা বিজাতীয় ভেদ ত দূরের কথা, স্বগত ভেদ পর্যন্তও নাই। কিন্তু রস যে বহু তাহাও মিথ্যা নহে। বিভাবানুভাবাদির বৈচিত্র্যবশতঃ রস বিচিত্র। বলাবাহুল্য, ইহা লৌকিক দৃষ্টির অনুযায়ী। কিন্তু এখানেও বিভাবাদি ত মূলে রসের অঙ্গভূত। ঘটাকারবিরহিত ঘটজ্ঞান যেমন কল্পনীয় নহে, অথচ অখণ্ডজ্ঞান নির্বিষয়ক, সেইরূপ বিভাবাদিবিরহিত খণ্ড রস কল্পনীয় নহে, অথচ রসসামান্যে বিভাবাদির অবভাস নাই। বিক্ষিপ্ত বৃত্তিতে ভেদবোধ পরিস্ফুট, সেখানে বিভাবাদি যে পৃথক্ ইহা অবশ্যই মানিতে হইবে। কিন্তু যেখানে রসস্ফূর্তি সেখানেও বিভাবাদি আছে, তবে উহা অভিন্নভাবে রসাঙ্গরূপে ভাসমান। ইহা বিশিষ্ট রস। রসসামান্যে অবশ্য বিভাবাদির অবভাস থাকে না। কিন্তু বিশিষ্ট রসের মধ্য হইয়া না গেলে রসসামান্যে উপস্থিত হওয়া যায় না। যখন বিশিষ্ট রসের স্ফুরণ হয় তখন রসসামান্যেরও স্ফুরণ হয়—অর্থাৎ রসস্ফূর্তিতে সামান্যাংশ ও বিশেষাংশ আছে, উভয়েই মিলিত। তন্মধ্যে

বিশেষাংশের নিরোধ হইলে সামান্যাংশ থাকিয়া যায়। যেমন সুবর্ণ ও কুণ্ডল,—একটি বিশিষ্ট আকারে আকারিত সুবর্ণই কুণ্ডল। উভয়ে তাদাত্ম্যসম্বন্ধ। যখন কুণ্ডল দেখি তখন যেমন সুবর্ণকেও দেখি, সেইরূপ যখন বিশিষ্টরসের আস্বাদন হয়, তখন সামান্যরসেরও আস্বাদন হয়। সামান্যরসকেই বিশেষবশতঃ বিশেষ রস বলা যায়। সেই বিশেষাংশ না থাকিলে—অর্থাৎ বিলীন থাকিলে, রস সামান্যই। উহা নির্বিশেষ, নিরাকার। যে বিশিষ্ট আকারনিমিত্ত সুবর্ণকে কুণ্ডলাদি বলি, সে আকার না থাকিলে সুবর্ণ যেমন সুবর্ণ মাত্র, নিরাকার সুবর্ণ, কুণ্ডলাদি নহে। এখানেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। সামান্যকে আশ্রয় করিয়াই বিশেষের স্ফূরণ হয়, আধারকে আশ্রয় করিয়াই আধেয়ের স্ফুরণ হয়, উপাদানকে আশ্রয় করিয়াই কার্যের স্ফূরণ হয়। কিন্তু বিপরীত মত সত্য নহে। কারণ বিশেষরহিত সামান্য, আধেয়হীন আধার, কার্যশূন্য উপাদান প্রতিভাত হইতে পারে। বলা বাহুল্য, সে স্থলে অপেক্ষা-বুদ্ধি না থাকার দরুণ সামান্য, আধার বা উপাদান ইত্যাকার ভাবে জ্ঞান হয় না। কিন্তু বস্তুজ্ঞান অবশ্যই হয়। এখন বুঝিতে হইবে, যে বিশেষের দরুণ এক রস নানা রস, সে বিশেষের স্বরূপ কি?

মনে করুন, এই বিশেষই উপাধি। ইহারই ভেদে রসের ভেদ হয়। বর্তমান অবস্থায় অর্থাৎ যখন আমরা বিক্ষিপ্ত বৃত্তির অধীন আছি তখন এ উপাধি যে বাহ্য ও অনিত্য তাহা অবশ্যই স্বীকার্য। বস্তুতঃ এ উপাধি বাহ্যও নহে, অনিত্যও নহে। কাজেই রসে নিত্যই অন্তরঙ্গভাবে এ বিশেষ লাগিয়া আছে, সুতরাং রস যে নিত্যই নানা, নিত্যই স্বভাবতঃই পরস্পর বিলক্ষণ, বিশিষ্ট, তাহা মানিতে হইবে। অতএব রস এক, সর্ব্বত্রানুস্যূত সামান্যভূত, ইহা যেমন সত্য, তেমনই রস অনন্ত, প্রতি রসই বিলক্ষণ ও বিশিষ্ট এবং এ বিশেষ স্বাভাবিক—কোন বাহ্য কারণসম্বন্ধবশতঃ নহে, ইহাও তেমনই সত্য। যেখানে রসাস্বাদ সেখানে বাহ্যত্ব, আগন্তুকত্ব সম্ভবপর নহে। বাহ্য ততক্ষণ যতক্ষণ ভেদ আছে, যতক্ষণ রসের উদয় হয় নাই। কিন্তু রসের অভিব্যক্তি হইলে বাহ্যত্ব থাকে না।

প্রশ্ন হইতে পারে—এ উপাধি অনিত্য নহে কেন? উত্তরে বক্তব্য—জগতের যাবতীয় বস্তুই উপাধিস্বরূপ। যে দৃষ্টিতে কোন বস্তুই অনিত্য বা অসৎ নহে সে দৃষ্টিতে এ প্রশ্নের সমাধান আপনা-আপনিই হইয়া যায়।

আপাততঃ যুক্তির দ্বারা ইহার সমাধান করিতেছি। অসৎ বলিলে কি বুঝায়? ইহাই বুঝায় যে, যেরূপটি একবার দৃষ্টিগোচর হয়, অভিব্যক্ত হয়, ঠিক সে রূপটি আর দেখা যায় না। প্রতি নিমেষেই এইরূপ পরিবর্তন হইতেছে; কিন্তু ইহার তাৎপর্য কি? একের পর আর—এইভাবে অনন্ত রূপপরম্পরা অভিব্যক্ত হইতেছে, অথবা যাহা দ্বারা দেখা হয়, সেই চিত্ত ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিতে পরিণত হইতেছে। বৃত্তি ভিন্ন রূপের অভিব্যক্তি যেমন কথার কথা, রূপ না হইলে শুদ্ধ বৃত্তিও তেমনই। আসল কথা, এই বিশিষ্ট বৃত্তি ও বিশিষ্ট রূপ মাখামাখি। ইহারই স্রোত চলিয়াছে,—ইহাকে কালস্রোত বলে। বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছি বলিয়া এই স্রোত আটকাইতে পারি না। কিন্তু কোন উপায়ে এই প্রবহমান স্রোতকে প্রতিবদ্ধ করিতে পারিলে স্থৈর্য আসিবে। অর্থাৎ বৃত্তি স্থির হইলে রূপও স্থির হইবে, রূপ স্থির হইলে বৃত্তিও স্থির হইবে। সুতরাং একাগ্র অবস্থায় যে রূপের প্রতিভাস হয়, সে রূপ চঞ্চল বা পরিবর্তনশীল নহে। যতক্ষণ চিত্তের একাগ্র অবস্থা থাকিবে, ততক্ষণ সেই স্থির বৃত্তির সম্মুখে রূপও অচঞ্চলভাবে প্রকাশমান থাকিবে। যদি এই একাগ্র অবস্থা ইচ্ছানুরূপ স্থায়ী থাকে,—যাহা মলিন প্রকৃতির ঊর্ধ্বে হইতে পারে, তাহা হইলে রূপের প্রকাশকাল স্বায়ত্ত থাকে। এই মনে করুন, একটি গোলাপফুলকে অবলম্বন করিয়া যদি আমার প্রজ্ঞার উদয় হয় এবং এই একাগ্র সমাধি যদি সহস্র বৎসর না ভাঙ্গে, তাহা হইলে ঠিক ঐ সহস্র বৎসরই ঐ গোলাপটির প্রকাশ থাকিবে। বিক্ষিপ্ত চিত্তের কাছে জগতের শত লক্ষ পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া থাকিলেও স্থিরচিত্তের নিকট ঐ একমাত্র রূপই প্রকাশমান। অবশ্য এ সমাধি ভাঙ্গিতে পারে। কিন্তু তাহার হেতু এই যে, ভাঙ্গিবার কারণ চিত্তে আছে। যখন সে কারণ থাকিবে না, অর্থাৎ যখন রজঃ ও তমঃ কাটিয়া যাইবে, যখন সত্ত্ব বিশুদ্ধ হইবে, তখন এ সমাধি সদাকালীন অথবা ইচ্ছানুরূপ স্থিতিশীল হইবে। জগতের যাবতীয় রূপই এক একটি প্রকাশ—মহাপ্রকাশের বিশিষ্ট বিলাস। আজ যদি সমাধি ভাঙ্গিয়া গিয়া কিম্বা আপন ইচ্ছায় সে রূপের তিরোধান হয়, তাহা হইলে ঠিক আবার সেইটিকেই উদ্ভাসিত করা যায়। কারণ তিরোহিত হইলেও উহা কখনই মহাপ্রকাশের নিকট তিরোহিত হয় না, হইতে পারে না; অব্যক্ত হয় শুধু বৃত্তিজ্ঞানের নিকট। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে সকল রূপই নিত্য, বস্তুমাত্রই সর্বদা সত্য। আর যে অবস্থায় সে রূপ ইচ্ছানুসারে

প্রকাশমান থাকে তখন উহা বাহ্য নহে, প্রকাশেরই অঙ্গরূপে অর্থাৎ অনঙ্গরূপে অবস্থিত।

অতএব উপাধি যখন নিত্যই অন্তরঙ্গভাবে প্রকাশমান, তখন অনন্ত বিশিষ্ট রস যে পরমার্থতঃ নিত্যকালই আছে,—অভিব্যক্তভাবেই আছে, তাহা স্বীকার্য। রস মাত্রই নিত্যসিদ্ধ, কদাপি সাধ্য নহে। তবে বৃত্তির অধীন বলিয়া আমরা উহা অব্যক্ত বলিয়া মানি। অভিব্যঞ্জক সামগ্রী আবরণ অপসারণ করিয়া নিত্যসিদ্ধ রসেরই উদ্বোধন করিয়া থাকে। এবং উদ্বোধনকালে অভিব্যঞ্জকও রসান্তর্গত হইয়া পড়ে।

অতএব মানিতে হইবে যে বিশিষ্টরস প্রকারে এবং সংখ্যায় সর্বদাই অনন্ত। কিন্তু অনন্ত হইলেও ইহার স্থিতি দ্বিবিধ। কখনও রসসামান্যে বিশেষ অন্তর্লীনভাবে শক্তিরূপে একাকার থাকে, কখনও বা পরিস্ফুটভাবে থাকে।

প্রথম শঙ্কার সমাধান একপ্রকার করা হইল। যাঁহারা মনে করেন, রসমাত্রই বিশেষাত্মক, সামান্য রস হইতে পারে না, তাঁহাদের মত সমীচীন বোধ হয় না। সামান্য না থাকিলে, বিশেষ থাকিতেই পারে না, একথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। বিশেষাবস্থায় যখন আস্বাদন আছে, তখন সামান্য অবস্থাকেও রস না বলিয়া পারা যায় না। তবে সে রস সাধারণতঃ আমাদের পক্ষে ধারণা করা কঠিন।

সুতরাং বুঝা গেল, রস এক হইলেও তাহাতে অনন্ত বৈচিত্র্যের শক্তি আছে এবং এই শক্তি কখনও কখনও প্রস্ফুট হয়। যাহার বলে রস আপন বৈচিত্র্যশক্তিকে প্রস্ফুটিত করে অথবা প্রস্ফুট বৈচিত্র্যকে অন্তর্লীন করে তাহাই তাহার স্বাতন্ত্র্য। এই শক্তি বা উপাধিই রসের দেহ। ইহা সূক্ষ্মরূপে রসে লীন থাকুক কিম্বা স্থূলভাবে বিকশিত হউক, সদাই আছে। এই দেহের সঙ্গে রসের অভেদ সম্বন্ধ। প্রাকৃত জগতে যেমন দেহ ও দেহী ভিন্ন, এখানে সেরূপ নহে।

এ ত হইল শুদ্ধাবস্থার কথা। আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর জগতেও ঠিক ইহারই অনুরূপ অবস্থা। এই যে অনন্ত বৈচিত্র্য দেখিতে পাই, ইহার প্রত্যেকটির

অর্থ আছে। এক একটি মুখের যে ভাব, শুধু মুখের ভাব কেন, এক একটি মনুষ্য—এক একটি পশুপক্ষী, এক একটি বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, এক একটি বিশেষ ভাবের বা রসের বিকাশ অর্থাৎ স্থূলভাবে প্রকাশ। তবে ইহা অমিশ্র নহে, এইমাত্র কথা। কোন মনুষ্যের চেহারা সেরকম না হইয়া অন্যরকম হইল না কেন, হইতে পারিত না, ইহাই তাহার উত্তর। প্রতি মনুষ্যই যখন ভাবের বিকাশ, তখন ভাবের বৈশিষ্ট্যানুসারে আকৃতির বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিক। আকৃতি ত ভাবেরই দেহ, সুতরাং ভাবের সহিত অভিন্ন। চরম পরমার্থ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে একদেহে একটি বিশিষ্ট ভাবেরই বিকাশ হয়, অন্য ভাবের হয় না। যত ভাব তত দেহ। একই দেহ অবলম্বন করিয়া বহু ভাব প্রকাশিত হইতে পারে না। তবে এক দেহের বহু বিলাস হইতে পারে—এক হিসাবে তাহাতেও ভাববৈচিত্র্য সম্পন্ন হয়।

ইহার পরে আর একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রতি জীবের একটি আপন রূপ আছে—সেটি যে বিনশ্বর পদার্থের মত কল্পিত রূপ, তাহা মনে করিবার কোনই হেতু নাই। যাবতীয় কল্পনার উপশম হইলেও তাহা থাকে। এই রূপ শুধু তাহারই রূপ, অন্যের নহে। ইহা ব্যতীত তাহার আর একটি রূপ আছে—সেটি সমভাবে সকল জীবেরই আছে, ঈশ্বরেরও আছে; এই দিক্ হইতে সে সকল জীবও ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন। প্রথমটি তাহার বিশেষ (Individual) রূপ, দ্বিতীয়টি সামান্য (Universal) রূপ। অর্থাৎ নির্বিশেষভাবে দেখিতে গেলে, যেমন সকল জীব এক এবং জীব ও ভগবান্ অভিন্ন, সবিশেষভাবে তেমনি প্রতি জীবই ভিন্ন এবং জীব ও ঈশ্বর পরস্পর বিভিন্ন। সুতরাং জীবে ও ঈশ্বরে, এবং জীবে ও জীবান্তরে এই ভেদাভেদ নিত্যই আছে। ভেদ যখন অনন্ত এবং অভেদ যখন এক, এবং উভয়ই যখন নিত্য, তখন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ভেদ হইতে অভেদের দিকে কিম্বা ভেদের দিকে দৃষ্টি অথবা ভাবও অনন্ত প্রকার। অর্থাৎ একটি জীব ভগবান্ অথবা জগৎকে যে চোখে দেখে, যেভাবে সংবেদন করে, অপর জীব ঠিক সেইরূপ করিতে পারে না। প্রতি জীবের দৃষ্টিকেন্দ্র স্বাভাবিকভেদ-বিশিষ্ট। সুতরাং ভগবানের সহিত এবং তাঁহারই অংশ জীবের সহিত প্রতি জীবেরই নিজের একটা বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে। ভগবানেরও তেমনি প্রতি জীবের সহিত একটি বিশিষ্ট ভাবময় সম্বন্ধ আছে।

এই পরস্পর সম্বন্ধ আবিষ্কারই রস সাধনার প্রথম সোপান। সৌন্দর্য-তত্ত্বের সাধনা তখনই যথার্থ সিদ্ধিলাভ করিয়াছে বলিতে পারা যায়, যখন পূর্বোক্তপ্রকারে রসসাক্ষাৎকার হইয়াছে। জীব শুদ্ধ চিৎশক্তি, তটস্থ হইলেও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এবং দর্পণবৎ স্বচ্ছ; তাহার উপরে অনন্তপ্রকার সৌন্দর্যের ছায়াপাত হয় বলিয়াই অনন্তপ্রকার বিশিষ্ট রসের আস্বাদন হয়। এই যে অনন্ত রস ইহা অনন্তপ্রকার, কারণ জীবসংখ্যা অনন্ত। প্রতি দৃষ্টি-কেন্দ্র হইতে সৌন্দর্যের আভাস অনন্ত, দৃষ্টিকেন্দ্র অনন্ত বলিয়া প্রত্যেকটি আভাসও অনন্ত।

এই যে জীবের সামান্য ও বিশেষ রূপের কথা বলা হইল, ইহার মধ্যে একটিকে ত্যাগ করিয়া অপরটি থাকিতে পারে না। যেখানে বিশেষরূপ অভি-ব্যক্ত সেখানেও অব্যক্তভাবে সামান্যরূপ থাকে, আর সামান্য রূপের অভিব্যক্তি-কালেও অপরিস্ফুট ভাবে বিশেষরূপ থাকে। অতএব ভেদ যেমন অভেদ-জড়িত, অভেদও তেমনি ভেদজড়িত। উভয়ে নিত্য সম্বন্ধ। ভেদাবস্থাতেও অভেদ আছে, তবে অভিভূত থাকে বলিয়া উহার উপলব্ধি মাত্র হয় না। অভেদাবস্থায় ভেদের সত্তাও সেইপ্রকার অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। বস্তুতঃ ইহার একটিও সাম্যভাব নহে। সাম্যভাব জীবভাব নহে, ঈশ্বরভাবও নহে, ভেদ বা অনেক নহে, অভেদ বা একও নহে—উহা সমকালে ভেদ ও অভেদ সমরূপে দুই-ই অথচ দুইয়েরই অতীত। জালন্ধরনাথের একটি কথা মনে পড়ে—

"দ্বৈতং বাঽদ্বৈতরূপং দ্বয়ত উত পরং যোগিনাং শঙ্করং বা।"

অর্থাৎ পরমার্থতত্ত্ব দ্বৈতও বটে, অদ্বৈতও বটে— অথচ বস্তুতঃ উহা দ্বৈতা-দ্বৈতবিকল্পের অতীত।

পূর্ণ রসস্ফূর্তির স্বরূপ আলোচনাপ্রসঙ্গে এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে। এই সাম্যভাবে না দাঁড়াইলে রসানুভূতি পূর্ণ হইতে পারে না। এইখানে দাঁড়াইলে সবই সুন্দর দেখায়, সবই ভাল লাগে, সকলের প্রতিই প্রেমের অভিব্যক্তি হয়—কেন না, সব যে আমারই রূপ। সে অবস্থায় সেটাকে 'আমি' বলি কিম্বা 'তুমি' বলি তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই। 'আমি' এবং 'তুমি' উভয় শব্দই সে অবস্থায় একই বস্তুর বাচক। উপনিষদগণ তাহাকে আত্মারাম অবস্থা

বলেন, ভক্তগণ তাহাকে পরাভক্তি বলেন—স্বরূপতঃ উভয়ে কোন ভেদ নাই। প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—

নমস্তুভ্যং নমো মহ্যং তুভ্যং মহ্যং নমো নমঃ।

প্রথমে 'তোমাকে' বলিয়া নমস্কার করিলেন, পরে প্রত্যগাত্মভাবের স্ফুরণের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন 'আমাকে নমস্কার'—পরে দেখিলেন, যেটা 'তুমি' সেটাই 'আমি', সুতরাং তুমি ও আমি একত্র জড়িত করিয়া বলা হইল। যেখানে 'তুমি' ও 'আমি'র সাম্যভাব উপলব্ধ হইয়াছে, সেখানে 'তুমি' বলিলে 'আমি'কে বুঝায়, 'আমি' বলিলেও 'তুমি'কে বুঝায়. একই পদার্থের দুইটি নাম 'তুমি' এবং 'আমি'।

সুফী সম্প্রদায়ের সিদ্ধ কবি হল্লাজ বলিয়াছেন—

I am He whom I love, He whom I love is I ,

We are *two* spirits dwelling in *one* body.

ইহা সেই উপনিষদুক্ত এক বৃক্ষে সমাসীন দুইটি পক্ষীর কথা—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিসস্বজাতে"।

পক্ষান্তরে জিলি বলিয়াছেন—

We are the spirit of *one*, though we dwell by turns in *two* bodies.

জলালুদ্দীন রুমিও প্রকারান্তরে সেই ভাবই প্রকাশ করিয়াছেন—

Happy the moment when we are seated, thou and I ;

With two forms and with two figures, but with one soul, thou and I.

জীব ও ঈশ্বরের ভেদাভেদ সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা স্পষ্টতর নির্দেশ আর কি হইতে পারে ?

যে এই ভাবে আরোহণ করিয়াছে সে আপনরূপে আপনি বিভোর হয়। একজন ভক্ত পূর্ণ সৌন্দর্যের অনন্ত সমুদ্রে ডুবিয়া, পরে সেই অবস্থার স্মৃতি অবলম্বনে গাহিয়াছিলেন—

অহো নিমগ্নস্তব রূপসিন্ধৌ

পশ্যামি নান্তং ন চ মধ্যমাদিম্।

অবাক্ চ নিঃস্পন্দতমো বিমূঢ়ঃ
কুত্রাস্মি কোঽস্মীতি ন বেদ্মি দেব ॥

এখানে তুমি-ভাব আশ্রয় করিয়া ভক্তের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। কাহারও আবার আমি-ভাবই প্রধানতঃ ফুটিয়া উঠে।

সাধারণ মনুষ্যের জীবনেও এমন শুভ মুহূর্ত কখন কখন আসে, যখন সে তাহার খণ্ড আমি বা পরিচ্ছিন্ন-অহংকে অতিক্রম করিয়া পূর্ণাহন্তার আভাস যেন কিয়ৎপরিমাণে প্রাপ্ত হয়। তখন জগতের সর্ববস্তুর দিকে, এমন কি তাহার আপন রূপের দিকেও সে বিস্ময়বিমুগ্ধ নেত্রে দৃষ্টিপাত করে—তখন তাহার নয়নসমক্ষে সবই যেন এক অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত বোধ হয়। তখন 'মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।' তখন সকলই—তুমি, আমি এবং জগৎ—সকল পদার্থই যে মধুময় তাহা বুঝা যায়। তখন মনে হয়, সুখ-দুঃখ আনন্দে ভরা, নিন্দা ও স্তুতি মাধুর্যপূর্ণ, ভাল-মন্দ একাকার। তখন অন্তরে ও বাহিরে একটা একতান মধুর স্রোত বহিতে থাকে। একটা অসীম অনন্ত মাধুর্যসাগর আপন উজ্জ্বল প্রকাশে আপনি আপনারই কাছে যেন প্রকাশমান হইয়া উঠে। কখনও তাহাতে তরঙ্গ থাকে, কখনও বা থাকে না, অথবা সমকালে তরঙ্গ ও স্থৈর্য উভয়ই থাকে—কিন্তু মাধুরীর হ্রাস হয় না। ইহাই পূর্ণ রসবোধের অবস্থা। এখানে মিলনে আনন্দ, বিরহেও আনন্দ—হাসিতে মধু, কান্নাতেও মধু।

যাহা আমি তাহাই তুমি, আবার যাহা তুমি তাহাই জগৎ—সুতরাং যাহাকে আত্মপ্রেম বলে তাহারই অপর পক্ষ ভগবৎ প্রেম, সেইরূপ ভগবৎ প্রেমের অপর দিক্ জীব ও জগতের প্রতি ভালবাসা। মূল বস্তু এক এবং অদ্বিতীয়।

একই পুরুষ উত্তম, মধ্যম ও প্রথম ভেদে কল্পিত হইয়াছে মাত্র। পূর্ণরসের উদ্বোধ হইলে, এই এক ও অখণ্ড প্রেমের বিকাশ হয়।

কিন্তু ভেদদৃষ্টিতে জীব, জগৎ ও ভগবানের স্বরূপগত পরস্পর বৈলক্ষণ্যও ত আছে। পূর্ণ রসাস্বাদনকালে তাহাও অবশ্যই প্রকটিত হয়। নতুবা আস্বাদনের পূর্ণতা অসিদ্ধ থাকিয়া যায়।

অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রতি জীব রসানুভূতিকালে এমন একটি অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে সে যে আনন্দের আস্বাদন করে,

অপর জীবও রসানুভব সময়ে তাহাই করে—কারণ তখন সেও যেমন পূর্ণ-আমি, অপর জীবও তাহাই, সুতরাং আস্বাদনকর্তা বস্তুতঃ একই। এই আনন্দই নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মানন্দ। কিন্তু শুধু এইটুকু বলিলেই ত চলিবে না। প্রতি জীবের স্বভাব যখন বিলক্ষণ, তখন একটি জীব যে বিশিষ্ট আনন্দের আস্বাদন করে, অপর কোন জীব তাহা করিতে পারে না, ইহা মানিতেই হইবে। এই আস্বাদনের প্রকার অনন্ত, সম্ভাবনীয়তা অপরিমিত। কাজেই কালাতীত ঐক্য অথবা ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইয়াও প্রতি জীবের আনন্দপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কদাচ ন্যূন হয় না। একটা স্থির আনন্দের বক্ষে নিত্য নূতন অপরূপ আনন্দ ফুটিয়া উঠে—ব্রহ্মানন্দের সমুদ্রবক্ষে এই ত নিত্যলীলার লহরমালা। এই বিশিষ্ট আনন্দের দিক দিয়াই ভগবানের সহিত জীবের গুপ্ত সম্বন্ধ।

এই সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়া বিশিষ্ট রসের আস্বাদনেই রসসাধনার সার্থকতা। রসজ্ঞ সামাজিকগণ এই জন্যই নির্বিশেষ সামান্যাত্মক ব্রহ্মানন্দ লাভকে রসচর্চার চরমফল বলিয়া মনে করেন না। স্বায়ম্ভুব আগমে আছে—

ব্রহ্মানন্দরসাদনন্তগুণিতো রম্যো রসো বৈষ্ণবঃ
তস্মাৎ কোটিগুণোজ্জ্বলশ্চ মধুরঃ শ্রীগোকুলেন্দো রসঃ॥

ব্রহ্মানন্দে সে মাধুর্য নাই, এমন কি বৈষ্ণবরসে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাধিপতি পরমাত্মানন্দরূপ রসেও শান্ত ও দাস্যের ঊর্ধ্বে গতি নাই বলিয়া মাধুর্যের সম্ভাবনা নাই। মাধুর্য একমাত্র ভগবদানন্দরসেই আছে। সখ্য ও বাৎসল্য অতিক্রম করিয়া উজ্জ্বল রসের মধ্যেই মাধুর্যের পরাকাষ্ঠা। অতএব সবিশেষ ভগবদ্‌ভাবে আরূঢ় না হইলে পূর্ণভাবে রসের আস্বাদন হইতে পারে না।

প্রত্যেকটি ব্যক্তির সহিতই সামান্যের একটি নিগূঢ় ও আন্তরিক সম্বন্ধ আছে। ব্যক্তি সামান্যকে সামান্যভাবে পাইয়া তৃপ্ত হয় না, তাহাকে আপন বিশিষ্টভাবে অনন্তকাল সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করে। যখন পারে তখনই সে যথার্থ রসিক, তৎপূর্বে নহে। প্রতি ব্যক্তির সহিত সামান্যের এই মিলন অতি গুপ্ত স্থানে সংঘটিত হয়—সে বিজন কুঞ্জমধ্যে আর কাহারও প্রবেশাধিকার নাই, কারণ সেখানে সামান্য শুধু সেই ব্যক্তিরই, অন্য ব্যক্তির নহে।

প্রতি ব্যক্তিই সামান্যকে বলিতে পারে—'তুমি আমারই—শুধু আমারই'। এ কথা সত্য। আবার এ কথাও সত্য যে, সামান্য সকল ব্যক্তিরই সমান ধন,

কাহারও নিজস্ব নহে। শ্রীকৃষ্ণ রাধাবল্লভ ইহাও যেমন সত্য, আবার গোপী-মাত্রেরই বল্লভ ইহাও তেমনি সত্য। তবে ইহার মধ্যে একটি রহস্য আছে। যে গুপ্ত স্ব-ধামে শ্রীকৃষ্ণ শুধু একজনের, যতক্ষণ ঠিক সে স্থানে না যাওয়া যায়, ততক্ষণ 'তুমি আমার' এ কথা বলা চলে, কিন্তু 'শুধু আমারই' এ কথা বলা চলে না। সেই স্ব-ভাবের নামই রাধাভাব। যে গোপী সেই মহাভাবময় স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠিত সে-ই রাধা।

আমরা পূর্ণ রসাস্বাদের একটু দিগ্‌দর্শন করিলাম। অভিনবগুপ্তাচার্য রসের যে স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে রসতত্ত্বের মূলসূত্রটি মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। রস নিত্য বস্তু—আস্বাদ্যমান না হইলে যখন রসপদের সার্থকতা নাই, তখন উহা নিত্যই আস্বাদ্যমান। কিন্তু আস্বাদন করে কে? যেখানে ভোগ্য নিত্য, ভোগও নিত্য, সেখানে ভোক্তাও যে অবশ্যই নিত্য তাহা সহজেই বুঝা যায়। সুতরাং, এ ভোক্তা "খণ্ড আমি" নহে, যে-আমি দেশে ও কালে পরিচ্ছিন্ন, মলিন সত্ত্বে উপহিত সে-আমি নহে, যে-আমি দেহসম্বন্ধ বলিয়া জন্মমৃত্যু ও সুখদুঃখের অধীন সে-আমি নহে, যে-আমি প্রাকৃতিক নিয়মের নিগড়ে শৃঙ্খলিত, অনাদি কর্ম-সংস্কারের বশবর্তী সে-আমি নহে—কিন্তু পূর্ণ, অপরিচ্ছিন্ন, নির্মল ও নিত্য আমি। এই "পূর্ণ আমি" দেশ কালের অতীত, প্রাকৃতিক দেহবিরহিত, জাগতিক নিয়মের ঊর্ধ্বে স্বাধীনভাবে নিত্য বিরাজমান—ইহার জন্ম-মরণ নাই, সুখ-দুঃখ নাই, বাসনা-কামনা নাই। এই পূর্ণ আমিই রসের আস্বাদয়িতা, ভোক্তা। কিন্তু ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ বস্তুতঃ একই পদার্থ—রসস্ফূর্তিকালে উহাদের পৃথগবভাস থাকে না, থাকিলে রসস্ফুরণ হইতে পারে না। "ভোক্তৈব ভোগ্যরূপেণ সদা সর্বত্র সংস্থিতঃ"। তবে যে ভোক্তা, ভোগ্য প্রভৃতি পদপ্রয়োগ করা হয়, সে কেবল অলৌকিক ত্রিপুটীর অনুরোধে। পানকরসের ন্যায় ভোক্ত্রাদি পদার্থত্রয় অনেক হইয়াও একাত্মক। সুতরাং অভিনবগুপ্তাচার্যের সার সিদ্ধান্ত এই যে, পূর্ণ আমিই নিত্য আপনাকে আপনি আস্বাদন করিতেছেন। এই আস্বাদন বা চর্বণ শুধু শুষ্ক জ্ঞানমাত্র (cognition) নহে—সাংখ্যের পুরুষ যেমন প্রকৃতিকে নির্লিপ্ত ও উদাসীন দৃষ্টিতে পৃথগ্‌ভাবে সাক্ষিরূপে দূর হইতে অবলোকন মাত্র করেন * তাহা নহে—ইহা ভাবময় অনুভূতি (feeling)। সুতরাং রস যখন

* প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ স্বস্থঃ প্রেক্ষকবদুদাসীনঃ।

ভাবের গাঢ় ও অভিব্যক্ত অবস্থা মাত্র, তখন উহা যে শুষ্ক জ্ঞানমাত্র নহে তাহা সুখবোধ্য। অর্থাৎ রসতত্ত্ব আনন্দাত্মক, শুধু চিদাত্মক নহে +। এইজন্যই আচার্য রসানুভূতিকে সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক এই উভয় বিরুদ্ধ কোটি হইতে পৃথক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কারণ, সবিকল্পকাদি ভেদ জ্ঞানগত, ভাবগত নহে।

রসই আনন্দ—রসই প্রেম। ইহা ভগবানের স্বরূপভূতা হ্লাদিনী শক্তির সারাংশ। এই জন্যই বৈষ্ণবাচার্যগণ প্রেমকে 'আনন্দচিন্ময় রস' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

প্রেমের যাহা আলম্বন, তাহা এই প্রেমে নিত্যই সংলগ্ন আছে। রসস্ফূর্তি-কালে অলৌকিক ত্রিপুটীর সত্তা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। আলম্বন আশ্রয় ও বিষয়ভেদে দ্বিবিধ। এখানে আশ্রয়ালম্বন কিম্বা ভোক্তা সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য নাই। কিন্তু প্রেমের বিষয়ালম্বন সৌন্দর্য। অর্থাৎ যাহা ভাল লাগে অথবা যাহা ভালবাসি, তাহাই সৌন্দর্য এবং ভাল লাগাই প্রেম। অতএব মূলতঃ প্রেম ও সৌন্দর্য অভিন্ন হইলেও রসস্ফূরণের দিক্ হইতে উভয় নিত্য সম্বদ্ধ।

আমরা সাধারণ অবস্থাতেও এই তত্ত্বের একটা পরিচয় পাই। কবি বলিয়াছেন—"ভাবের অঞ্জন মাখি যে দিকে পালটি আঁখি, নেহারি জগৎ এই অসীম সুন্দর।" অর্থাৎ হৃদয়ে ভালবাসা থাকিলে, চক্ষু সেই রাগে রঞ্জিত হইলে সর্বত্রই সৌন্দর্য দেখিতে পাওয়া যায়, অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে হয় না। ভালবাসাই সৌন্দর্যকে প্রকাশ করে। যাহাকে যে ভালবাসে, তাহাকে এইজন্যই সে সুন্দর না দেখিয়া পারে না। তাই স্নেহময়ী জননীর চোখে কানা ছেলেও পদ্মপলাশলোচন বলিয়া প্রতিভাত হয়। আবার, যেখানে সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ হয়, সেখানে ভালবাসা আপনিই জাগিয়া উঠে। উভয় পক্ষই বীজাঙ্কুরবৎ পরস্পর জড়িত। রসানুভূতি যখন ভোক্তার দিক্ হইতে

+ 'শুধু চিদাত্মক নহে, বলিবার তাৎপর্য এই যে সাংখ্যোক্ত কৈবল্য রসপদবাচ্য নহে। পুরুষ চিৎস্বরূপ—এই স্বরূপাবস্থিতিই কৈবল্য। ইহা আনন্দাত্মক অবস্থা নহে। এইজন্য বৈদান্তিক ও বৈষ্ণবাচার্যগণ এ অবস্থাকে পরমপুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন না। এখানেও বস্তুতঃ আবরণের সত্তা আছে। যখন এই আবরণ অপগত হইবে, যখন চিৎতত্ত্ব অবাধিত হইবে, তখনই আনন্দের প্রকাশ হইবে। কারণ অবাধিত আত্মবিশ্রান্ত চৈতন্যই আনন্দের স্বরূপ।

ফোটে, তখন প্রথম পক্ষ এবং যখন ভোগ্যের দিক্ হইতে জাগে, তখন দ্বিতীয় পক্ষ সার্থক বলিয়া বুঝা যায়। ঐ অনুভূতি কাহার কোন্ দিক্ হইতে কখন্ জাগে, তাহা বলা যায় না। বস্তুতঃ দুই পক্ষই সমান সত্য। অর্থাৎ প্রেম ও সৌন্দর্য উভয়ে পরস্পর ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জক সম্বন্ধ। কোন্‌টি পূর্বে, কোন্‌টি পরে, সে প্রশ্নের উত্তর নাই।

আমরা এই দুই দিক্ হইতে কথাটার একটু আলোচনা করিব। সর্বদেশে ও সর্বকালেই প্রাজ্ঞগণ এই তত্ত্বটি স্বীকার করিয়াছেন। শকুন্তলার সেই—

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকীভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি ॥

এই শ্লোকে কালিদাস এই তত্ত্বেরই ইঙ্গিত করিয়াছেন। রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতির রমণীয়তা বলিলে সৌন্দর্যই বুঝায়। কালিদাস বলেন, এই সৌন্দর্য-দর্শনে চিত্তে ভালবাসার বা "সৌহৃদের" স্মৃতি জাগিয়া উঠে—যদিও সে স্মৃতি অস্পষ্ট হউক, যদিও উহা অবুদ্ধিপূর্বক হউক এবং যদিও সে ভালবাসা "ভাবস্থির" হউক, তথাপি উহা ভালবাসারই স্মৃতি বটে। কিন্তু যাহার অনুভব হয় নাই, তাহার ত স্মরণ হয় না, সুতরাং মানিতে হইবে আমরা সৌন্দর্যকেই ভালবাসিয়াছিলাম। নতুবা সৌন্দর্যদৃষ্টে ভালবাসার স্মৃতি জাগিত না।

সৌন্দর্য ও সুন্দর, প্রেম ও প্রেমিক, একই। ধর্ম ও ধর্মীতে স্বরূপগত কোন ভেদ নাই। যে জ্ঞাতা সেই জ্ঞান, যে আনন্দময় সেই আনন্দ, যে চেতন সে-ই চৈতন্য—আবার বিষয়ও সে-ই।

কিন্তু তবু জ্ঞানাংশে বহুত্বের আরোপ হয়, জ্ঞাতা একই থাকে। উপাধি-ভেদে সৌন্দর্য অনন্ত হইলেও সুন্দর একই বটে, তেমনই উপাধিভেদে প্রেম অনন্ত হইলেও প্রেমিক একই, তাহা সত্য।

প্রেমিক যেন "আমি," আর সুন্দর যেন "তুমি"। জগতের যত সৌন্দর্য্য সবই যখন এক সৌন্দর্য, তখন একমাত্র অদ্বিতীয় সুন্দর তুমি। সব প্রেমই যখন মূলে এক প্রেম, তখন একমাত্র অদ্বিতীয় প্রেমিক আমি। তোমার

অনন্ত সৌন্দর্য, আমার অনন্ত প্রেম—প্রকারে অনন্ত, কালে অনন্ত, দেশে অনন্ত, বৈচিত্র্যে অনন্ত—ইহাতেই তোমাতে আমাতে নিত্যলীলা। অবশ্য এ লীলার স্ফূর্তি তখন সম্ভবপর যখন তুমি ও আমি স্বরূপে সজাগ থাকি। *

সুতরাং লীলা অনন্ত, ধাম অনন্ত, আস্বাদন অনন্ত। এইজন্যই পূর্ণ সৌন্দর্য চিরপুরাতন হইয়াও প্রতিক্ষণে রসিকের নিকট 'নিত্য নূতন' রূপে প্রতিভাত হয়। 'জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন ন তিরপিত ভেল'—দেখিয়া দেখিবার আকাঙ্ক্ষা কখনই নিবৃত্ত হয় না।

ভালবাসা ও সৌন্দর্য জলপিপাসা ও জলের সহিত উপমেয়। সৌন্দর্য ভিন্ন ভালবাসার দ্বিতীয় কোন অবলম্বন নাই। শ্রদ্ধা বা নিষ্ঠার একমাত্র বিষয় যেমন সত্য, জ্ঞানের একমাত্র বিষয় যেমন মঙ্গল বা নিঃশ্রেয়স, প্রেমের একমাত্র বিষয় তেমনই সৌন্দর্য বা প্রেয়ঃ। যদি জগতে জল বলিয়া কোন পদার্থ না থাকিত তাহা হইলে পিপাসাও থাকিত না, কারণ জল ও পিপাসা পরস্পর সাপেক্ষ। সেই জন্যই পিপাসার সত্তাই জলের সত্তা প্রমাণিত করে।

বস্তুতঃ পিপাসা জলের অভাব সূচনা করে অথবা সত্তা সূচনা করে, তাহা আলোচনার বিষয়। পিপাসা বিরহ,—উহা এক দিকে যেমন মিলনের অস্পষ্ট স্মৃতির উদ্দীপক, অপর দিকে তেমনি মিলনের সংঘটক। পিপাসা শব্দের অর্থ কি? (ক) 'আমি জল চাই' এই যে বোধ ইহাতে জল কি তাহা আমার স্মৃতিপথে উদিত হয়। তেমন ভাবে স্মরণ করিতে পারিলে এই বোধ হইতেই জলের আবির্ভাব হইতে পারে,—এটি সৃষ্টিরহস্য।† এক হিসাবে স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা ব্যতিরেকে অনুভব ও স্মৃতিতে মূলে কোন ভেদ নাই,—স্মৃতি বস্তুতঃ অস্পষ্ট অনুভব আর অনুভব স্পষ্টীকৃত স্মৃতি। উভয়ে কালগত ভেদ ভিন্ন আর

---

* নানা ভক্তে রসামৃত নানাবিধ হয়। সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয়॥ চৈ. চরিতামৃত, মধ্য লীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ। শ্রীভগবান্ই সকল রসের বিষয় ও আশ্রয়। সুতরাং বস্তুতঃ ভক্ত ও ভগবান্ অভিন্ন। লীলারস আস্বাদনের জন্য এই অভেদের মধ্যে রূপভেদ জাগিয়া উঠে।

† এই জন্যই আগমিকগণ স্মৃতিকে সর্বসিদ্ধিপ্রদানসমর্থ চিন্তামণির সহিত তুলনা করেন এবং মন্ত্রাদির প্রাণস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। "ধ্যানাদিভাবং স্মৃতিরেব লব্ধ্বা চিন্তামণিস্ত্বদ্‌বিভবং ব্যনক্তি"।

বিশেষ কোন ভেদ থাকিতে পারে না। অতীতের আবরণ সরাইলে তাহাই বর্তমান। বর্তমানে আরোপ পরাইলে তাহাই অতীত—কালিক ভেদ কল্পনাপ্রসূত। যে কোন বস্তু সম্বন্ধে তীব্র ইচ্ছা, ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা জাগিলেই সে বস্তু সৃষ্ট হয় অথবা অভিব্যক্ত হয়। স্মৃতি অবলম্বন না করিয়া ইচ্ছার উদয় হওয়া সম্ভব নহে। ইচ্ছার উদয় হইলে প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। শীঘ্র কি বিলম্বে, এখানে কি দেশান্তরে প্রাপ্তি ঘটিবে তাহা ইচ্ছার তীব্রতার উপর নির্ভর করে। উৎকট ইচ্ছা হইলে দেশকালের কোন নিয়ম থাকে না। ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার পূর্ণতা সম্পাদিত হয়।

যেখানে পিপাসা এই প্রকার তীব্র, সেখানে জল ত পিপাসা হইতে আপনি ফুটিয়া বাহির হইবে। সুতরাং সেস্থলে পিপাসা জলের সত্তাসূচক ও সত্তার আবিষ্কারক। (খ) পক্ষান্তরে পিপাসা শব্দে কণ্ঠশুষ্কতা প্রভৃতি বোধের অবসানকামনা বুঝায়। এই স্থলে জললাভের আশা নাই, কারণ জল ত ইচ্ছার বিষয় নহে। যাহা চাওয়া হইতেছে তাহা কণ্ঠশুষ্কতার নিবৃত্তি, সে বোধ অস্পষ্ট হইলেও পিপাসুর অবশ্যই আছে। শাস্ত্রীয় ভাষায় ইহারই নাম দুঃখনিবৃত্তি অথবা শান্তি, এই ইচ্ছার ফলে জল ব্যতিরেকেই পিপাসার নিবৃত্তি হয়। এ স্থলে পিপাসা জলের ভাব কিম্বা অভাব কিছুই সূচনা করে না।

আমরা যাহাকে অভাব বলি তাহা বস্তুতঃ আংশিক আবরণ মাত্র। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অভাব বলিয়া কোন পদার্থ নাই। যেটি অভাবের প্রতিযোগী অভাবজ্ঞান তাহারই স্মৃতিঘটিত। এই স্মৃতিতে ভাবই আলম্বনস্বরূপ, সেই জন্য স্মৃতির গাঢ়তায় অর্থাৎ অভাববোধের তীব্রতায় ভাবের উদয় হয়। ইহা যোগবিজ্ঞানের একটি গূঢ় তত্ত্ব। আমের অভাববোধ আমের স্মৃতি ভিন্ন যখন হয় না এবং আমের স্মৃতিতে যখন সূক্ষ্মভাবে আমই আলম্বন রহিয়াছে, তখন বলিতেই হইবে, আমের অভাববোধের মূলেও আম আছে। সুতরাং, তীব্রভাবে সে বোধ জন্মিলে ঐ সূক্ষ্ম বা অব্যক্ত আম স্থূলরূপে, ব্যবহারিকভাবে অভিব্যক্ত হইবে; অতএব আমের অভাব মানে আমের সূক্ষ্ম সত্তা, ঐকান্তিক অভাব নহে। ঐকান্তিক অভাব প্রতিযোগি-নিরপেক্ষ, ভাষায় তাহার ব্যপদেশ সম্ভবে না, চিন্তারাজ্যেও তাহার স্থান নাই। আমরা যে অভাব শব্দের প্রয়োগ করি, তাহা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করিলে ভাবরূপেই

পরিগণিত হয়, কিন্তু উহা ব্যবহারযোগ্য ভাব নহে। আমরা অভাবকে যে আংশিক আবরণ বলিয়াছি, এবার তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

পিপাসা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, ভালবাসা সম্বন্ধেও ঠিক সেই সব কথা প্রযোজ্য। বলা বাহুল্য, এ আলোচনা খণ্ড আমি অথবা পরিচ্ছিন্ন অহঙ্কারের দিক হইতেই করা হইতেছে। যে যেপ্রকার ভালবাসা আকাঙ্ক্ষা করে, যে বিশিষ্ট সৌন্দর্যকে বিষয়রূপে প্রাপ্ত হইতে কামনা করে, তাহা অবশ্যই আছে। ভালবাসা তীব্র হইলেই সে সৌন্দর্য প্রকাশিত হইবে। অনন্ত সৌন্দর্যের ভাণ্ডার অনন্ত। চাহিতে জানিলেই ভাণ্ডার খুলিতে পারা যায়। এইজন্য নরোত্তম দাস বলিয়াছেন যে, রাগমার্গের সাধনার প্রধান বিশেষত্ব শুধু আকাঙ্ক্ষা করা--"ভাবনা করিবে যাহা সিদ্ধ দেহে পাবে তাহা," ইহা অতি সত্য কথা।

আমরা পূর্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতেই কাম ও সৌন্দর্যের সম্বন্ধও বুঝিতে পারা যাইবে। সংস্কৃতসাহিত্যে যেরূপ কামদেব ও রতিতে প্রাকৃত সৌন্দর্যকল্পনার চরম উৎকর্ষ হইয়াছে, গ্রীক সাহিত্যেও সেইরূপ। কাদম্বরীতে কুসুমায়ুধকে "ত্রিভুবনাদ্ভুতরূপসম্ভাররূপে" বর্ণনা করা হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে। কামকে "রূপৈকপক্ষপাতী" এবং "নবযৌবনসুলভ" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। Venus, Aphrodite, Adonis, Eros প্রভৃতির রূপ বর্ণনা আলোচনা করিলে প্রাচীন পাশ্চাত্য সাহিত্যেও যে কামদেবেই সৌন্দর্য কল্পনার উৎকর্ষ হইয়াছে, তাহা বিশ্বাস হয়। যে কোন কারণেই হউক সৌন্দর্য কামের উদ্দীপক এবং কাম সৌন্দর্যের প্রকাশক—এ কথা অস্বীকার করা চলে না। পণ্ডিত Remy de Gourmont তাঁহার 'Culture des Ideas' (১৯০০, পৃঃ ১০৩) গ্রন্থে বলিয়াছেন—"That which inclines to love seems beautiful ; that which seems beautiful inclines to love. This intimate union of art and love is indeed the only explanation of art. * * * Art is the accomplice of love." অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতও এ বিষয় লইয়া অনেক গবেষণা করিয়াছেন। পণ্ডিত শান্তায়ন (G. Santayana) তাঁহার "The Sense of Beauty" নামক গ্রন্থে, গ্রোস (Gross) "Der æsthetische Genuss" নামক গ্রন্থে, কলিন স্কট "Sex and Art" নামক প্রবন্ধে (American Journal of

Psychology, সপ্তম ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ২০৬ পৃষ্ঠা), স্ট্রাজ (Stratz) তাঁহার "Die Schönheit des Weiblichen Korpos" নামক পুস্তকে এই বিষয়ের সবিশেষ চর্চা করিয়াছেন। শাস্তায়ন স্পষ্টাক্ষরে যৌন আকর্ষণকে (sexual attraction) সৌন্দর্যবোধের (aesthetic contemplation) অঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে বিশিষ্ট (specific) যৌন ভাবও (sexual emotion) সৌন্দর্যবোধের অন্তর্গত। গ্রোস দেখাইয়াছেন যে, যৌন ভাব ও সৌন্দর্যবোধ পরস্পর সম্বন্ধ। কামশাস্ত্রেও এই বিষয়ের আলোচনা আছে। কামতত্ত্বের স্ফুরণ না হইলে চেহারায় লাবণ্য খেলে না, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ।

বস্তুতঃ প্রেম ও কামে স্বরূপগত কোন প্রভেদ নাই। একই রস উভয়থা অভিহিত হয়। প্রাচীনকালে উভয় নাম এক বস্তুরই বাচক বলিয়া পরিচিত ছিল। "প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।" শ্রীকৃষ্ণের বীজমন্ত্র কামবীজ, গায়ত্রী কামগায়ত্রী। "কামাদ্ গোপ্যঃ", এ কথা চিরপ্রসিদ্ধ। জগতের আদিদম্পতী কামেশ্বর-কামেশ্বরী, ইহা আগম শাস্ত্রে পরিচিত। আদিরস শৃঙ্গার কামাত্মক। এই সব স্থলে কামশব্দে প্রেমই বুঝিতে হইবে।

সাধারণতঃ ব্যবহারে কাম ও প্রেমের যে ভেদ লক্ষিত হয়, যাহা অবলম্বন করিয়া চৈতন্যচরিতামৃতে কামকে লৌহ ও প্রেমকে সুবর্ণ বলা হইয়াছে, সেই ভেদের কারণ রসের শুদ্ধতা কিম্বা মলিনতা। বাহ্য বিষয়ের উপরাগবশতঃ রসের মলিনতা হইয়া থাকে। কবিরাজ গোস্বামী বলেন যে, আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা কাম, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা প্রেম। বলা বাহুল্য, ইহাতেও সেই তত্ত্বই প্রকটিত হইয়াছে।

মোট কথা, এ ভেদ প্রাচীন আচার্যগণও জানিতেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত মদন, কামদেব প্রাকৃত মদন। মদন কিন্তু একই—প্রকৃতির ঊর্ধ্বে' অর্থাৎ রজঃ ও তমঃ সম্পর্কশূন্য হইলে, মদন শ্রীকৃষ্ণ। ইনি 'কোটীকন্দর্পলাবণ্য,' 'সাক্ষান্মন্মথমন্মথ'—ইনিই আগমের ললিতা বা সুন্দরী। মহাযোগী কিম্বা মহাজ্ঞানীও এ বিশ্ববিমোহিনী মহাশক্তির

কটাক্ষপাতে বিচলিত হইয়া উঠেন। * কামদেব ইঁহারই কণামাত্র সৌন্দর্য পাইয়া ত্রিভুবনকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। সৌন্দর্যলহরীকার বলিয়াছেন—

> হরিস্ত্বামারাধ্য প্রণতজনসৌভাগ্যজননীং
> পুরা নারী ভূত্বা পুররিপুমপি ক্ষোভমনয়ৎ।
> স্মরোঽপি ত্বাং নত্বা রতিনয়নলেহ্যেন বপুষা
> মুনীনামপ্যন্তঃ প্রভবতি হি মোহায় মহতাম্‌॥

সৌন্দর্য একই—অপ্রাকৃতভাবে শ্রীকৃষ্ণে, প্রাকৃতভাবে কামদেবে। অপ্রাকৃত সৌন্দর্য ও অপ্রাকৃত কামের সমরসাবস্থা শুদ্ধ শৃঙ্গার, প্রাকৃত সৌন্দর্য ও প্রাকৃত কামের সাম্যাবস্থা মলিন শৃঙ্গার। অতএব কাম ও সৌন্দর্য রসস্ফূর্তি-কালে নিত্যমিলিত ভাবেই প্রকাশমান হয়।

এক মহাসৌন্দর্যেরই অনন্ত কলা অনন্ত খণ্ডসৌন্দর্যরূপে নিত্য প্রকাশমান রহিয়াছে। এই সকল শুদ্ধ, কালাতীত কলা কালশক্তির আশ্রয়ে মলিন এবং বিনশ্বর ভাবে প্রকাশ পায়।

> অব্যাহতাঃ কলাস্তস্য কালশক্তিমুপাশ্রিতাঃ।
> জন্মাদিষড্‌বিকারাত্মভাবভেদস্য যোনয়ঃ॥

জগতের সৌন্দর্য দেখিয়া পূর্ণসৌন্দর্যের স্মৃতি হৃদয়ে জাগে বলিয়াই প্রাণ কাঁদে। একজন ভাবুক কবি † এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"The youth sees the girl ; it may be a chance face, a chance outline amidst the most banal surroundings. But it gives the cue. There is a memory, a confused reminiscence. The mortal figure

* শৃঙ্গাররসরাজময় মূর্ত্তি ধর। অতএব আত্মপর্যন্ত সর্বচিত্তহর॥ চৈ, চরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ। শ্রীভগবান্‌ আপন সৌন্দর্য্যে আপনি পর্য্যন্ত মোহিত হইয়া পড়েন। ললিতমাধবে আছে—"অপরিকলিতপূর্বঃ কশ্চমৎকারকারী স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য-পূরঃ। অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব।" পূর্ণ সৌন্দর্যের এমনি আকর্ষণ!।

† Edward Carpenter : "The Art of Creation," p. 137.

without penetrates to the immortal figure within, and there rises into consciousness a shining form, glorious, not belonging to this world, but vibrating with the agelong life of humanity, and the memory of a thousand love-dreams. The waking of this vision intoxicates the man ; it glows and burns within him ; a goddess (it may be Venus herself) stands in the sacred place of his temple ; a sense of awestruck splendour fills him and the world is changed." দেশকালের বাহিরে এই পূর্ণ সৌন্দর্য, সামান্যতঃ এবং বিশেষতঃ, আমরা আস্বাদন করিয়াছি। তাহারই পুনঃ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় ঐন্দ্রিয়ক জগতে বিচরণ করিতেছি—কিন্তু এখানে উহা পাইবার সম্ভাবনা নাই। যেখানে যাহা কিছু দেখি, যাহা কিছু শুনি, মনে হয় সবই যেন পরিচিত, অতি পরিচিত, অথচ এই পরিচয়ের উপরে একটা আড়াল পড়িয়া গিয়াছে। ইন্দ্রিয় শুধু আংশিকভাবে ও ক্ষণিকভাবে সে আড়াল সরাইয়া দেয়—তখনই চির-পরিচিতকে "এই যে" বলিয়া চিনিয়া ফেলি।

যে সংসারসুখে সুখী, সেও সৌন্দর্যের মোহন করস্পর্শে ব্যাকুল হইয়া উঠে, যেন কিসের বিরহে কাতর ও চঞ্চল হয়। বস্তুতঃ সে তখন অজ্ঞাতসারে জন্মান্তরের সৌহৃদ স্মরণ করে। অনন্ত প্রকারের অনন্ত বিশিষ্ট ভাব হৃদয়ে স্থির হইয়া আছে—বিভাবাদির প্রভাবে তাহারই কোনটি না কোনটি অকস্মাৎ রসরূপে জাগিয়া উঠে।

এক সৌন্দর্যই যখন নানা সৌন্দর্য এবং সেই মৌলিক নানা সৌন্দর্যই যখন জগতের ভিন্ন ভিন্ন সৌন্দর্যরূপে প্রকাশমান, তখন জগৎ যে সৌন্দর্যসার তাহা বুঝা যায়। সকল বস্তুই সুন্দর, সবই রসময়, কিন্তু চিত্তে মল ও চাঞ্চল্য আছে বলিয়া দেখিবার সময় তাহা অনুভূত হয় না। রস তখন সুখ-দুঃখরূপে এবং সৌন্দর্য সুন্দর-কুৎসিতরূপে বিভক্ত হইয়া পড়ে, কালের স্রোত সবেগে বহিতে থাকে এবং আমাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। তখন শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ে বিভাগ হয়, নীতির জগতে নামিয়া পড়ি, পাপপুণ্যের আবির্ভাব হয় ও রাগদ্বেষসম্ভাবনা ফুটিয়া উঠে।

যে দিকে তাকাই সে দিকেই যদি সৌন্দর্য না দেখিতে পাই, যাহাকে

দেখি তাহাকেই যদি ভালবাসিতে না পারি, তবে রসসাধনার সিদ্ধি হয় নাই বুঝিতে হইবে। সৌন্দর্য অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে হয় না, ভালবাসার কোন হেতু নাই। পূর্ণ সৌন্দর্য, পূর্ণ প্রেমের সহিত স্বাভাবিক মিলনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে জগতের যাবতীয় বস্তুর সহিতই স্বাভাবিক মিলন ফুটিয়া উঠে, যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন কেহই পর থাকে না, কিছুই কুৎসিত থাকে না। মানুষের জীবনে সৌন্দর্যসাধনার ইহাই যথার্থ পরিণাম।

রবীন্দ্রনাথ ও বলাকা

অনেক দিন হইতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা ছিল। বাল্যকালেই তাঁহার কবিপ্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভক্ত-বিনম্র হৃদয়ের পূজার অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছিলাম। অজ্ঞাত-হৃদয়ের সে নীরব উপাসনা নীরবে উত্থিত হইয়া নীরবেই বিলীন হইয়াছে। মনে পড়িল আজ সেই নব কৈশোরের কথা—যখন বাল্যকাল অতীত হইয়াছে, কিন্তু যৌবনের সঞ্চার হয় নাই, সেই স্বপ্নময় আবেশময় আধ-আলো আধ-ছায়াময় বয়ঃসন্ধিকালে রবি-কবির কল্পনা-রশ্মিপাতে, সন্ধ্যালোকে রাগারুণ আকাশ-মণ্ডলের ন্যায় জীবনের আদর্শখানা বিচিত্ররঙে রঞ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন কি দেখিতাম, কি বুঝিতাম. কি ভাবিতাম, এখন তাহা ঠিক তেমন করিয়া অনুভব করিবার উপায় নাই। তবে এটুকু মনে আছে যে রবীন্দ্রের কাব্য-মুকুরে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষাময় অব্যক্ত বেদনা ও আনন্দে-ভরা রহস্যপূর্ণ জীবনের প্রতিবিম্বখানা প্রতিফলিত দেখিতে পাইতাম। তাই প্রাণে সাড়া জাগিত—হৃদয়ের নিগূঢ় প্রদেশ হইতে কি এক বিচিত্র প্রভাবে প্রাণের স্পন্দন ফুটিয়া উঠিত। যে অনন্ত ভাবের খেলা দেখিতে দেখিতে এখন প্রাণ আত্মহারা হয় ও সময়ে সময়ে যেন মহাভাবে মগ্ন হইয়া সকল ভাবের অতীত পরম অব্যক্ত পদে স্থিতি লাভ করে, তাহার প্রথম উন্মেষ তখনই অনুভব করিতাম।

যাহার করস্পর্শে হৃদয়-তন্ত্রী এই ভাবে বাজিয়া উঠিত, তাঁহার সহিত একটু ভালো করিয়া পরিচিত হইতে অনেক সময়েই ইচ্ছা হইত। ইচ্ছা হইত, একবার সেই শিল্পীর প্রকৃত স্বরূপ নিরীক্ষণ করি—যাঁহার মোহন প্রতিভা হৃদয়ে এইপ্রকার অপরূপ ইন্দ্রজালের অবতারণা করে। যে নিগূঢ় কেন্দ্রস্থল হইতে এই বৈচিত্র্যময়ী সৃষ্টির ধারা স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে সেই মর্মস্থান দেখিতে সাধ যাইত। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের ভাবরাজ্যের উৎস কোথায় এক একবার তাহা অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে ইচ্ছা হইত। কিন্তু নানা কারণে সে ইচ্ছা কার্যে পরিণত হইতে পারে নাই। সামর্থ্যের অভাব ও অবসরের অপ্রতুলতা তন্মধ্যে প্রধান। এখনও সেই কারণে রবীন্দ্রের কাব্য সমালোচনা করিবার গুরুতর ভার আমি নিজের উপর গ্রহণ করিতে সাহস

পাই না। বহু যোগ্যতর ব্যক্তি সে কঠিন কর্তব্য অংশতঃ সম্পাদন করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে আরও অনেকে করিবেন। তাই আমার পক্ষে সে ভার গ্রহণের প্রয়োজনও অনুভব করি না।

তবে আমার কোন কোন স্নেহাস্পদ বন্ধুর সানির্বন্ধ অনুরোধে রবীন্দ্রনাথের ভাবগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা সংক্ষেপে বলিতে আমি প্রবৃত্ত হইয়াছি। বলা বাহুল্য, ইহা কাব্য-সমালোচনা নহে। রবীন্দ্রনাথের বর্তমান কাব্যগ্রন্থাবলীতে—বিশেষতঃ নৈবেদ্যের পরবর্তী কাব্য-সাহিত্যে, তাঁহার যে বিশিষ্ট ভাবমূর্তি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য। তাঁহার 'বলাকা' নামক কাব্যখানা অবলম্বন করিয়াই আমি তাঁহাকে বুঝিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু প্রসঙ্গতঃ মূল বক্তব্য পদার্থের পরিস্ফুটতা সাধনের জন্য প্রয়োজনানুসারে অন্যান্য গ্রন্থেরও উল্লেখ থাকিবে।

মানুষের পূর্ব ইতিহাস কি? যে আমিত্ব তাহার ভিতরে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে অথবা বিকাশোন্মুখ হইয়াছে তাহার প্রথম উন্মেষও যখন লক্ষিত হয় নাই তখন সে কোথায় ছিল? সেটা কি অবস্থা? তাহার স্বরূপ কি? কবি বলেন—সেটি অব্যক্ত পদ, সেখানে আমি-তুমির ভেদ নাই, অভেদও নাই, যেখানে আলো নাই, আঁধারও নাই, কোনও প্রকার দ্বন্দ্ব নাই, তাহাকে মানবীয় ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সেই অনন্ত অজানা, যেখানে আপনাতে আপনি মগ্ন—জোয়ার-ভাঁটার অতীত, সঙ্কোচ-প্রসারের ঊর্ধ্বে, শুভাশুভের উপরে সেই নিত্য পূর্ণ সনাতন রহস্য সদা বিরাজমান। সেখানে দুঃখ নাই, আনন্দও সেখানে খেলে না। বায়ু সেখানে বহে না, কালের স্রোত সেখানে নিস্তব্ধ, আধার শক্তি সেখানে বিলীন। 'নাহি রাত্রি দিনমান আদি অন্ত পরিমাণ, সে অতলে গীত গান কিছু নাহি বাজে'। সেই চির নীরব গম্ভীর প্রশান্তি-সমুদ্রে কি এক অনির্বচনীয় স্বভাবের প্রেরণায় এক দৈব মুহূর্তে স্পন্দন উঠিল।

যেই স্পন্দন উঠিল, অমনি অব্যক্ত গর্ভ হইতে 'আমি'র উদয় হইল। 'আমি' উঠিল, 'তুমি'ও উঠিল—অব্যক্ত অনন্ত সত্তা দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া 'আমি-তুমি' রূপ ধারণ করিল। অব্যক্ত রূপে ভগবান অপ্রকাশ, আমিত্বের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি স্বপ্রকাশ হইলেন। যতক্ষণ তিনি আপনাতে আপনি ডুবিয়া

একাকা থাকেন ততক্ষণ নিজেকেও দেখেন না কিংবা জানেন না। এইটি একজাতীয় নিদ্রা (ঘুম)। ইহার ভঙ্গই তাঁহার আত্মপরিচয় বা আত্মবোধ—অর্থাৎ—'আমা'র উৎপত্তি। সঙ্গে সঙ্গে মহাশূন্যে আনন্দময়ী জ্যোতির্ময়ী সৃষ্টির ধারা বহিতে থাকে—

যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা,
আপনাকে তো হয়নি তোমার দেখা।

আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম,
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দ কুসুম।

সুতরাং এক হিসাবে বলা যায় যে 'আমি'ই তাহার স্বরূপগত নিত্যানন্দ আস্বাদনের সাধন। মধুতে মাধুর্য থাকিলেও যদি তাহার সম্ভোগ না হয় কিংবা হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তাহা হইলে উহাকে মধুব বলিয়া বিশেষিত করা নিরর্থক। তদ্রূপ সেই অনন্ত ও পূর্ণবস্তু আনন্দস্বরূপ হইলেও যতক্ষণ সে আনন্দের আস্বাদন না হয় ততক্ষণ তাহাকে রসবস্তু বলিয়া ধারণ করা চলে না। উপনিষদে আছে—'স একাকী নারমত। তস্মাদ্ দ্বিতীয়মসৃজৎ' ইত্যাদি। এক অনন্ত অদ্বিতীয় সত্তার মধ্যে যতক্ষণ স্বগত হইতে দ্বিতীয়ের স্ফুরণ না হয় ততক্ষণ ঐ সত্তা নিজেব কাছে নিজে পরিচিত হইতে পারে না, ততক্ষণ উহা চৈতন্য নামের অযোগ্য। আদি তত্ত্বের সহিত এই নবোদিত দ্বিতীয়ের যে লীলাবিলাস তাহাই আনন্দরূপা সৃষ্টিধারার উৎস। ইহাই সংক্ষেপতঃ সচ্চিদানন্দভাবের রহস্য। এই যে নবোদ্গত 'দ্বিতীয়', কবির ভাষায় ইহাই 'আমি'। ইহা দ্বিতীয় হইলেও অনন্ত হইতে উদ্ভূত বলিয়া তাহা হইতে অভিন্ন। কারণ সেই পূর্ণ বা অনন্ত সত্তাই 'আমি' ভাবে প্রকাশমান—'আমি' তাঁহারই আত্মপ্রকাশ। এই অখণ্ড বিশুদ্ধ 'আমি'র নিকটে পূর্ণ সত্তা উদ্বুদ্ধ হইয়া যেরূপে প্রকাশিত হন তাহাই 'তুমি'। অনন্তই 'আমি' রূপে আবির্ভূত হইয়া 'তুমি' রূপে ভাসমান নিজেকে নিরীক্ষণ করেন। জগতের যত 'আমি' সব এই 'বিরাট আমির'ই ব্যষ্টিরূপ। তদ্রূপ 'তুমি' ও জগতে বস্তুতঃ একাধিক বর্তমান নাই। সকল দৃশ্য ও জ্ঞেয় পদার্থের অন্তর্দেশে সেই একমাত্র অখণ্ড 'তুমি'ই বিদ্যমান রহিয়াছে।

'আমি' জীব, 'তুমি' ঈশ্বর,—উভয়ই পরস্পরসাপেক্ষ। যখন আছে তখন দুই-ই আছে। না থাকিলে কেহই নাই। একমাত্র অজ্ঞাত রহস্য আপনার মধ্যে আপনি গোপন আছে।

অব্যক্তরূপ মহাসমুদ্র মথিত হইয়া যখন এইপ্রকারে জীবেশ্বর বিভাগ হয় তখন সৃষ্টির বিকাশ হয়, পৃথিবীতে স্বর্গের জন্ম হয়, এই শুভ মুহূর্তে অনন্তের গর্ভ হইতে অনন্তনিহিত পূর্ণ সৌন্দর্য ও পূর্ণ কল্যাণ রূপের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। একের কায তপস্যা ভঙ্গ করা, নবজাত জীবকে উন্মনা করা, নববসন্তের মদিরা স্পর্শে তাহার প্রাণমন আকর্ষণ করিয়া নিরন্তর বিক্ষিপ্ত করা—

একজন তপোভঙ্গ করি'
উচ্চহাস্য অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি'
নিয়ে যায় প্রাণমন হরি',
দু'হাতে ছড়ায়ে তা'রে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে,
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে,
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।

ভিতর হইতে বাহিরে ঠেলিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দেওয়া ইহার কায। এই সৌন্দর্য স্বর্গের অপ্সরা, বিশ্বকামনার শ্রেষ্ঠ ধন! দ্বিতীয়ের কায বিক্ষিপ্ত প্রাণ-মনকে গুটাইয়া আনা এবং শোক দুঃখের মঙ্গলময় স্পর্শে বাসনাকে সংযত ও শীতল করিয়া জীবকে সফলতা ও শান্তি দান করা ও জগতের সঙ্গে তাহার আনন্দময় যোগসূত্র প্রতিষ্ঠাপিত করা। এই মঙ্গল-মূর্তি সকল বিশ্বের জননীরূপা, স্বর্গের অধিশ্বরী। ইহারই কল্যাণময় প্রভাবে জীব জীবন-মরণের অতি পবিত্র সঙ্গম-স্থলে অনন্তের পূজা-মন্দিরে স্থানলাভ করে—

আর জন ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশির স্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায় ;
হেমন্তের হেমকান্ত সকল শান্তির পূর্ণতায়
ফিরাইয়া আনে।
নিখিলের আশীর্বাদ পানে।
অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিত হাস্য সুধায় মধুর।

সৌন্দর্য চঞ্চল শোভাময়, কল্যাণ স্থির লাবণ্যময়, সৌন্দর্য উগ্র, কল্যাণ স্নিগ্ধ, সৌন্দর্যে বাসনার ও কামনার উদ্দীপন হয়, কল্যাণে তাহার উপশম হয়—একের প্রবাহ অন্তর হইতে বাহিরের দিকে, অভেদ হইতে ভেদের দিকে, অপরের প্রবাহ বাহির হইতে অন্তরের দিকে, ভেদ হইতে অভেদের দিকে। বহির্মুখা শক্তির টানে জীব ক্রমাগত নিষ্ফলতার দিকে ছুটিতে থাকে, অন্তর্মুখা শক্তি তাহাকে কোলে আনিয়া প্রশান্তি ও সিদ্ধি দান করে। উভয়ই অনন্তের শক্তি —অব্যক্তরূপ যোগনিদ্রার ভঙ্গে যখন স্পন্দময়ী বিরাট মহাশক্তির বিক্ষোভ ও চলন হয় তখন 'আমি-তুমি'রূপ স্বপ্রকাশময় লীলাময় ভেদাভেদ ভাবের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মহাশক্তিরও অন্তর্গতি ও বহির্গতি অভিব্যক্তি লাভ করে। তবে প্রথমে স্বভাবের নিয়মে বহির্গতিই জাগে, তারপর অন্তর্গতি বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

অতএব জীব যখন জীবরূপে জাগিয়া উঠে তখন হইতেই ভগবান হইতে তাহার বিচ্ছেদের প্রারম্ভ। এই বিচ্ছেদই সৃষ্টির আদিম রূপ। প্রকারান্তরে বলা যাইতে পারে যে অনন্তের বিচ্ছেদ শক্তি হইতেই 'আমি' ভাবের প্রাদুর্ভাব হয়। তাই যখন কাল-স্রোতে সর্বপ্রথম 'আমি'-কে অস্ফুট আলোকে ভাসতে দেখি তখনই ইহাকে অসহায় ও বিরহী দেখিতে পাই। অবশ্য তখন সে নিজের অসহায়তা ও বিচ্ছেদ সম্বন্ধে সজাগ হয় নাই। জীবের এই বিচ্ছেদও অতি বিচিত্র ব্যাপার। ইহা ঐকান্তিক নহে। কারণ ভগবান্ আত্মগোপন করিয়া জীবের সঙ্গে সদাই বর্তমান আছেন। সুতরাং ইহাও বলা যায় যে অনন্তের মিলনশক্তি হইতেই 'আমি' বা জীবভাবের উদ্ভব হয়। প্রকৃত কথা এই যে বিরহশক্তি ও মিলনশক্তি কিছু পৃথক নহে। অব্যক্তাবস্থায় আমিত্বের কোন চিহ্ন ছিল না, তাই তখন মিলন বা বিরহ কিছুই ছিল না। যখন সেখানে 'আমি'র উদয় হইল তখন এমন এক অবস্থার আবির্ভাব হইল যাহাকে বিরহও বলা চলে, মিলনও বলা চলে। বস্তুতঃ উহা উভয়ের বীজভাব মাত্র। জীবের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন ভাবে ভগবান্ রহিয়াছেন, কিন্তু তাহার বোধ জীবে নাই।

এই বোধের আবির্ভাবই জীবের ক্রমবিকাশ। জীবভাব সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া যায়। রূপে রূপান্তরে, জন্মে জন্মান্তরে, সকল বৈচিত্র্য ভেদ করিয়া তাহাকে মানুষভাব পর্যন্ত উঠিতে হয়। সমগ্র বিশ্বই জীবের উত্থান-সোপান। তবে মানুষভাবে না আসা পর্যন্ত 'আমিত্ব' পরিস্ফুট হইয়া ব্যক্তিত্বরূপে পরিণাম

লাভ করে না। ব্যক্তিত্ব জাগিবার সঙ্গে সঙ্গে অব্যক্ত, অজ্ঞাতস্বরূপ ভগবানের স্মৃতি জাগিয়া উঠে। মনে পড়ে, কি যেন তাহার ছিল, কি যেন হারাইয়া গিয়াছে; যেন তাহারই অন্বেষণে সে অনাদিকাল হইতে নিরুদ্দেশ যাত্রায় ছুটিয়া বাহির হইয়াছে।

তাই মানুষভাবেই জীবের প্রথম বিরহ জাগে। অবশ্য প্রথমেই যে জাগে তাহা নহে। কত জন্ম কাটিয়া যায়, কত অবস্থার পর অবস্থা অতিবাহিত হয়, —একদিন হঠাৎ বিলাসমণ্ডপে আরামের শয্যাতে বৈরাগ্যের রাগিণী বাজিয়া উঠে, চিরপরিচিতের মধ্যে অপরিচিতের আকর্ষণ প্রবল হইয়া দেখা দেয়, সম্পূর্ণ অপরিচিতের মধ্যেও চিরকালের পরিচয় আত্মপ্রকাশ করে। অতুল ঐশ্বর্যের উপকরণ তখন বুভুক্ষিত মানব-হৃদয়ের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হয় না। এই অনন্ত সুষমাপূর্ণ ধরণীর শ্যামল শোভা, আকাশের কমনীয় নীল কান্তি, গ্রহ-নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা, শরতের সূর্যোদয়, বসন্তের পূর্ণিমা নিশীথ—সকলেই তাহার হৃদয়ে অভাব জাগাইয়া তোলে, সকলেই তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে সে প্রিয়-বিরহিত। প্রকৃতির বিচিত্র সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে তাহার চিত্ত উদাস হইয়া উঠে। এইভাবে তাহার বিচ্ছেদবোধ প্রথম আবির্ভূত হয়। কিন্তু কিসের বিচ্ছেদ তাহা সে বুঝিতে পারে না। ক্রমশঃ এই বিচ্ছেদ-বেদনা গভীর হইতে গভীরতর আকার ধারণ করে, কিন্তু বিচ্ছেদের বিষয় তখনও ধরা দেয় না। 'অচিন পাখী' অচিনই থাকিয়া যায়—সহস্র পরিচয়ের মধ্যেও যে অপরিচয়ের অবগুণ্ঠন একেবারে উত্তোলিত হয় না। কত বারে কত ভাবে কত রূপের মাঝখানে বিদ্যুতের আকস্মিক চমকের মতন জীব ক্ষণেকের জন্য অরূপের দর্শন পায় বটে এবং বলিয়া থাকে—

> জ্যোৎস্না নিশীথে, পূর্ণ শশীতে,
> দেখেছি তোমার ঘোমটা খসিতে,
> আঁখির পলকে পেয়েছি তোমায়
> লখিতে।

কিন্তু মুহূর্ত পরেই সে বুঝিতে পারে যে অধরাকে ধরা যায় না। ধরিবার চেষ্টা বৃথা—

> তবু সংশয় জাগে, ধরা তুমি দিলে কি?

সে ভাল দেখিতে পায় না। সব সত্য। সে শত শৃঙ্খলে শতধা বিজড়িত, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবুও এই জীবকে দেখিবার জন্য, পাইবার জন্য, বক্ষে জড়াইয়া ধরিবার জন্য ভগবানের ব্যাকুলতার সীমা নাই।

আমার চোখে লজ্জা আছে, আমার বুকে ভয়।
আমার মুখে ঘোম্‌টা পড়ে রয়।
দেখতে তোমায় বাধে বলে' পড়ে চোখের জল ;
ওগো আমার প্রভু
জানি আমি তবু
আমায় দেখবে বলে তোমার অসীম কৌতূহল ;
নইলে তো এই সূর্য তারা সকলি নিষ্ফল।

এক কথায় বলিতে গেলে, যেদিন অব্যক্ত-গর্ভ হইতে এই আমিত্ব রূপ জীবভাব জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেইদিন হইতেই নিস্পন্দ বক্ষে কম্পন উঠিয়াছে, দ্বন্দ্বাতীত মহা-শান্তির উপরে আনন্দ ও বেদনার লহর চলিয়াছে, বসন্তের সঞ্চারে প্রাণের উৎকণ্ঠা সজীব হইয়া উঠিয়াছে, সংক্ষেপতঃ, অনন্ত অরূপ 'আমি'-রূপে সুখদুঃখের মধ্য দিয়া নিজের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

আমি এলেম, কাঁপল তোমার বুক,
আমি এলেম, এল তোমার দুখ,
আমি এলেম, এল তোমার আগুনভরা আনন্দ,
জীবনমরণ তুফান-তোলা ব্যাকুল বসন্ত।
আমি এলেম, তাইত তুমি এলে,
আমার মুখে চেয়ে
আমার পরশ পেয়ে
আপন পরশ পেলে।

মানুষের এমন কি বৈশিষ্ট্য আছে যাহার জন্য অনন্ত ঐশ্বর্যের অধীশ্বরকেও তাহার নিকট ভিখারী সাজিয়া হস্ত-প্রসারণ করিতে হয়? মানুষের প্রকৃত গৌরব কোথায়? দীন হীন অকিঞ্চনের এমন কি 'গুপ্ত-ধন' আছে যাহার

সন্ধান পাইয়া সম্রাটও তাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন? অন্য জীবে তাহা নাই কি? ইহার উত্তর এই—জগতের সকল জীবের মধ্যেই যদিও আমিত্ব ন্যূনাধিক পরিমাণে বর্তমান আছে, তথাপি তাহা বিশ্বপ্রবাহের বেগ অতিক্রম করিয়া পরিস্ফুটতা অবলম্বনপূর্বক ব্যক্তিত্বরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয় নাই। একমাত্র মানুষের মধ্যেই উহা ব্যক্তিত্বরূপে বিকশিত হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। যেদিন মানুষের সেই স্বরূপযোগ্যতা প্রকৃতই বিকাশ প্রাপ্ত হয় সেদিন মানুষের বড় শুভদিন। সেইদিন হইতেই তাহার নব-জীবনের সূত্রপাত হয়।

এই যে ব্যক্তিত্ব ইহাও ভগবানের দান। অন্য জীবকে তিনি ইহা দেন নাই। অবশ্য, তাহাদিগের মধ্যে সকলকেই তিনি কিছু-না-কিছু দান করিয়াছেন। একজনকে যাহা দিয়াছেন, অপরকে তাহা দেন নাই। যাহাকে যাহা দিয়াছেন সে তাহাই লইয়া তাঁহার সেবা করিয়া থাকে। অন্যথা করে না, করিতে পারেও না, কিন্তু এ সেবাতে ভগবানের তৃপ্তি নাই। কারণ ইহাতে স্বাতন্ত্র্য নাই, শুধু অন্ধ নিয়মের অনুবর্তিতা মাত্র আছে। একমাত্র মানুষই ভগবদ্দত্ত ব্যক্তিত্বের মহিমায় এই নিয়মের শৃঙ্খল কাটাইয়া উঠিতে পারে। তাহার ইহাই গৌরব যে সত্য সত্যই সে ভগবানকে এমন কিছু দান করিতে পারে যাহা তাহার নিতান্তই নিজস্ব, যাহা তাহার প্রাপ্ত ধন অপেক্ষা অধিক। যাহা পাওয়া যায় তাহাকে আপন করিয়া লইয়া পুনরায় তাঁহাকে সমর্পণ করা—ইহাতেই পাওয়ার সার্থকতা। অন্য কোন জীবের এই ভাবে 'মমত্ব' দ্বারা নিজস্ব করিবার ক্ষমতা নাই, তাই আর কাহারও নিজস্ব নাই। তাহারা যাহা পায় ঠিক ঠিক তাহাই ফিরাইয়া দেয়—তাহাকে বাড়াইতে কিংবা রূপান্তর করিয়া দিতে পারে না।

পাখী গান গাইয়াছে, তাহাই সে স্বভাবতঃ দান করে। মানুষ পাখীর মতন গান গায় নাই, স্বর পাইয়াছে, কিন্তু সেই স্বরকে ভাঙ্গিয়া সে গান রচনা করিয়া তাঁহাকে সমর্পণ করে। বাতাস স্বাধীনতা পাইয়াছে, সে স্বভাবতঃই তাঁহার ভৃত্য। মানুষকে সে স্বাধীনতা অর্জন করিয়া লইতে হয়। তাহাকে তিনি শত বন্ধনে বদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু মৃত্যুর মধ্য দিয়া ওই বন্ধন-ভার একটি একটি করিয়া সে ত্যাগ করে ও অগ্রসর হইতে থাকে। ক্রমে এমন দিন আসে যখন সে বন্ধনহীন বলিয়া রিক্তহস্ত হয়,—মুক্ত হয়। তখন তাহার স্বাধীন ভাবে

সেবা করিবার অধিকার জন্মে। এই স্বাধীন সেবাই প্রেমের সেবা—ইহাতেই মানুষের গৌরব ও ভগবানের তৃপ্তি। পূর্ণিমা হাস্যময়, সুখ স্বপ্নময়—তাই তাহার স্বভাব, সেইজন্য সে আনন্দ-রস স্বভাবতঃই বিতরণ করে। কিন্তু মানুষকে তিনি দুঃখ দিয়াছেন—কাঁদিতে কাঁদিতে মানুষ সেই দুঃখকে আনন্দে পরিণত করে ও মিলনের সময় সেই আনন্দ ভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া জীবন সার্থক করে। এ সংসার স্বভাবতঃ সুখ-দুঃখময়—মানুষের এই কর্তব্য যে এই সংসারকে সে ভগবানের জন্য স্বর্গরূপে গঠন করে। তাহার হাত শূন্য বটে, কিন্তু সে-শূন্যতার অন্তরালে প্রচ্ছন্নরূপে ভগবান্ হাসিতেছেন। এই শূন্য হাতেই মানুষ স্বর্গরচনায় সমর্থ হয়।

বড় দুঃখের ভিতর দিয়া মানুষের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠে। যে যাহা মূলধন পায় তাহার ভিত্তিতে নিজেকে বিশিষ্টরূপে গঠন করে। তখন সে স্বাধীন হয় ও স্বাধীন ভাবে ভগবানকে ভালবাসা দান করে। এই ভালবাসা অমূল্য—এই উপহার একমাত্র মানুষের কাছেই তিনি পাইতে পারেন। ইহার জন্যই তিনি কাঙ্গাল। ইহাই মানুষের 'গুপ্তধন'। যিনি অতুল সম্পদের অধিকারী, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যাঁহার অক্ষুণ্ণ প্রতাপ অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক বিধানরূপে অপ্রতিহতভাবে বিরাজমান, যাঁহার মণিময় মুকুটের এক একটি ছটা হইতে সংখ্যাতীত চন্দ্র-সূর্যের উদ্ভব হইয়া থাকে, যাঁহার কটাক্ষপাতে কত কত জগতের সৃষ্টি-সংহার কাল-সমুদ্রে বুদ্বুদে উত্থান-পতনের ন্যায় ধারাবাহিকরূপে নিরন্তর চলিতেছে, তিনিও আপন রত্ন-মণ্ডিত রাজসিংহাসন পরিহার করিয়া ঐ মধুর রসের লোভে মধুলুব্ধ ভৃঙ্গের ন্যায় মানুষের জীর্ণ পর্ণকুটীরে অতিথি ভিখারী বেশে নামিয়া আসেন।

অসীম ধন ত আছে তোমার
তাহে সাধ না মেটে।
নিতে চাও তা আমার হাতে
কণায় কণায় বেঁটে।

(গীতিমাল্য)

আর সকলেরে তুমি দাও।
শুধু মোর কাছে তুমি চাও!

আমি যাহা দিতে পারি আপনার প্রেমে,
সিংহাসন হ'তে নেমে
হাসি মুখে বক্ষে তুলে নাও
মোর হাতে যাহা দাও
তোমার আপন হাতে তা'র বেশি ফিরে তুমি পাও।

(বলাকা)

যেদিন মানুষের হৃদয়ে ভগবৎ-প্রেম জন্মলাভ করে সেই দিনই ভগবানের সহিত তাহার মালাবদল হয়—মিলন হয়। এ মিলনের ঘটক প্রেম—প্রেমই জীব ও ভগবানের হৃদয়কে অচ্ছেদ্য যোগ-সূত্রে বাঁধিয়া রাখে।

যিনি অপরিচিত তাঁহাকে কি মানুষ ভালবাসিতে পারে? পারে বৈকি। অচেনাকেই ত ভালবাসা যায়, কারণ তাহার সীমা দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই তাহার মধ্যে প্রেমিকের হৃদয় স্বাধীনভাবে সঞ্চরণ করিতে অবকাশ পায়। যেখানে সীমা দেখিতে পাওয়া যায় সেখানে ভালবাসা থাকে না—যাহা থাকে তাহা শুধু মায়ার শৃঙ্খল, ইন্দ্রিয়ের পিপাসা। তবে সীমার মধ্যে যখন অসীম আত্মপ্রকাশ করে তখন সীমাবদ্ধ বস্তুও সীমা হারাইয়া ফেলে ও প্রাণকে আকর্ষণ করে। অসীম অপরিচিত—জীবনের প্রতি মুহূর্তে সে পরিচিত হইতেছে বটে কিন্তু সে পরিচয়ের অন্ত নাই। এ জগৎ শত পরিচয়ের পরেও অপরিচিতই থাকিয়া যায়, ইহার চির নবীনতা কখনই ম্লান হয় না। কিন্তু তবু ইহা প্রাণকে মোহিত করে।

অসীমের সীমা নাই—সীমার মধ্যেও তাহার সীমা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাই তাহাকে চেনা কোন কালে শেষ হয় না, হইতে পারে না। জীব নিত্য নব পরিচয়ে তাহাকে লাভ করে। অনন্ত কাল এইভাবেই চলিতে থাকে।

চেনার শেষ নাই বটে, কিন্তু তবু চেনা যায়। মানুষ যাহা চায়, মানুষের মনের মানুষ, তাহার সাধনার ধন: জীবনের আদর্শ, আকাঙ্ক্ষিত প্রেম ও সৌন্দর্যের ছবি, অব্যক্তভাবে অনন্তের বুকে লুক্কায়িত থাকে। যুগের পর যুগ কাটিয়া যায়, কত কত জন্ম অতিবাহিত হয়, কত কঠোর তপস্যা, কত হা-হুতাশ, কত অন্বেষণ করিয়াও সে তাহা পায় না। কিন্তু হঠাৎ একদিন অতর্কিত ভাবে তাহা তাহার হৃদয়াকাশে ফুটিয়া উঠে। তখন সে যুগব্যাপী সাধনা ও

পরিশ্রম সেই নিমেষের দর্শনেই সার্থক হইয়া যায়। সেই এক নিমেষের হাসি তাহার চির আশার সফলতা।

অচেনাকেই চিনিবার জন্য জীবনের সাধনা। অচেনাও ধরা দিবার জন্য ব্যাকুল। দুঃখরূপে, মৃত্যুরূপে সেই ত আসে। কঠোরতার মূর্তি ধরিয়া সেই প্রকাশ পায়। হৃদয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া অহমিকার ঘনান্ধকারে মানুষ ঘুমাইয়া থাকে। সেই দ্বার ভগ্ন করিয়া নির্মমভাবে অহঙ্কারকে চূর্ণ করিয়া ভগবানের কৃপা হৃদয়ে উজ্জ্বল ভাবে আবির্ভূত হয়। তখন হৃদয় আলোকিত হয়, বন্ধন খসিয়া যায়, মলিনতা ও ভয় দূর হয়, নবীন জীবন সঞ্চারিত হয়, প্রাচীন সংস্কার নষ্ট হইয়া যায়।

দুঃখই ভগবানের আত্মপ্রকাশের প্রকৃত নিদর্শন। 'তুমি যে আছ বক্ষে ধরে বেদনা তাহা জানাক্ মোরে'—দুঃখই জানাইয়া দেয় যে ভগবান্ নিত্যই জীবের সঙ্গে আছেন, তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া আছেন। দুঃখের মাত্রা তাঁহারই আত্মপ্রকাশের নিবিড়তা। যখন জীব সুখে থাকে, তখন তাহাকে বড় সন্তর্পণে থাকিতে হয়, কারণ স্বেচ্ছাচারের বশবর্তী হইয়া চলিতে গেলে তাঁর বিরাগ জন্মাইবার সম্ভাবনা। কিন্তু যখন জীবকে তিনি দুঃখে ফেলেন, আঘাত করেন, তখন আর সাবধানতার প্রয়োজন থাকে না। তখন বন্ধন কাটিয়া যায়—স্বাধীনতার উদয় হয়, যে প্রবল আত্মাভিমান জীবকে শক্ত শৃঙ্খলে জড়িত করিয়া রাখে তাহা বিলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে মুক্ত হয়, ছুটি পায়। তখন—

"দেবার নেবার পথ খোলসা ডাইনে বাঁয়ে।"

তখন সমগ্র জগৎ জীবকে ডাকিতে থাকে—সকলেই তাহাকে ঘর ছাড়াইয়া দেয়। জীব তখন আর নিজের কল্পিত গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না, দুঃখ-দৈন্যময় ঘোর অন্ধকারে অসীম অনন্ত মৃত্যু-সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়ে। ক্ষুদ্র ভালবাসাই মায়া,—তাহাতে জীব বদ্ধ হইয়া ভুলিয়া থাকে। কিন্তু যখন সে মায়া কাটাইয়া বাহির হইয়া পড়ে, যখন সে লাঞ্ছিত, অপমানিত, নিঃসঙ্গ, তখন আর তার বন্ধন কোথায়? সে তখন বাত্যাতাড়িত উদ্দাম বৈশাখী মেঘের মতন ছুটিতে থাকে, 'আপন তেজে', 'একাকী', অনাদরের খোলা রাস্তায় চলিতে থাকে। কিন্তু এ অনাদরই বস্তুতঃ ভগবানের "চরণ ধূলায় রঙীন চরম সমাদর!"

জীব জীবভাবে জন্মগ্রহণ করিয়া শুধু আপন গর্ভধারিণীকেই দেখিতে পায় —বাহিরের বিশ্ব তাহার চোখে পড়ে না, ভগবানের বিরাট্‌রূপ সে আর দেখিতে পায় না। ভগবানের আদর আবরণবিশেষ, ইহা সম্ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই ত জীব ভগবান্‌কে ভুলিয়া যায়, তাঁহাকে জানিতে পারে না। দুঃখ, কষ্ট, আঘাত—এই আবরণ ভাঙ্গিয়া চৈতন্য সঞ্চার করে। বিচ্ছেদবোধ প্রাণকে সজাগ করে, ঠেলা খাইয়া দূরে আসিলেই অসাড়তা ও মোহনিদ্রা স্বভাবের নিয়মেই কাটিয়া যায়, তখন ভগবানের রূপা চোখে পড়ে।

সেইজন্য দুঃখ যে তাঁহার অনুগ্রহের নিদর্শন তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ইহা ঠিক জোয়ারের জলের মতন তাঁহা হইতে স্বতঃই উচ্ছ্বসিত হইয়া আসে। আসিয়া সৌন্দর্যমণ্ডিত এই জগতের সর্বত্র তাঁহারই আভাস দেখাইয়া দেয়। তখন জলে স্থলে নভস্থলে সর্বত্রই তাঁহার ডাক শুনিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ পবন, নব বসন্তের বনশ্রী, মেঘমুক্ত নীলাকাশ—তাঁহারই ডাক! এই ডাকে জীব আকৃষ্ট হইয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হয়,—মরণ-পথে, মুক্তি-পথে, নিজেকে বিলাইবার পথে ধাবমান হয়। পরে তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিলে বন্ধনের মূল কারণ নিবৃত্ত হয়।

জীব বধূ—প্রাণপ্রিয় ভগবান্ মৃত্যুরূপে, 'সর্বনাশী'র রূপে তাহার নিকটে বর সাজিয়া আসেন। ঘোর বিপদ্, আশাভঙ্গ, নিষ্ফলতা এসব তাঁহারই রুদ্রভাবে আবির্ভাবের চিহ্ন। জীবের কর্তব্য—তাঁহাকে চিনিয়া তাঁহাকে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া বরণ করিয়া লওয়া। কিছু গোপন রাখিলে চলিবে না। তখন অহঙ্কার চূর্ণ হইবে, উন্নত মস্তক ঐ চরণে নত হইবে, ঘরে আর সুখনিদ্রার উপযোগী স্তিমিত প্রদীপ জ্বলিবে না। কিন্তু তাহাতে ভয়ের কারণ নাই। ঘর তখন প্রবল বাত্যার তাড়নায় মুহুর্মুহুঃ কম্পমান হইবে, তাহাতেই বা চিন্তা কোথায়? নির্ভীক হৃদয়ে, অটল বিশ্বাসে, অদম্য ধৈর্যসহকারে বাহির হইতে হইবে—মুক্তপথে চলিতে হইবে। গম্যস্থানের নির্দেশ থাকিবে না—তবু চলিতে হইবে। নিজের আরামকুঞ্জ ভাঙ্গিয়া গেল বলিয়া খিন্ন হইলে চলিবে না। বুঝিতে হইবে এ ভাঙ্গন কারাভঞ্জন—ফল, মুক্তি। শৃঙ্খল ভাঙ্গিলে দুঃখ কিসের?

বাহির পানে ছোটে না, সকল দুঃখ-সুখের শেষে গো।

সত্যই দেহ ছাড়িলে, দেহাত্মবোধ বা অহঙ্কার নিবৃত্ত হইলে, সুখ-দুঃখ থাকে না। দেহই ঘর—কারা-ঘর, তাহার সঙ্গে যা কিছু সংসৃষ্ট তাহাও তাই। ইহা গেলে সুখও যায়, দুঃখও যায়—"অশরীরং বাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ"। তাহাই মুক্তি—"বাহিরে ছোটা"।

সুতরাং জীবনের আদর্শ আরাম বা শান্তি নহে--স্থিতিশীলতা নহে। ভগবানের কাছে আরাম চাওয়ার ন্যায় লজ্জার বিষয় আর কি আছে? যে দুঃখে তাঁহারই জয়-জয়কার হয়, গৌরব ঘোষিত হয়, নিজের পরাজয় হয়, অহঙ্কার চূর্ণ হয়, সেই দুঃখই ত প্রার্থনীয়। জীব নিজের মিথ্যা কর্তৃত্বাভিমানে অন্ধ হইয়া বদ্ধ হইয়া প্রকৃত কর্তা বা প্রভুকে ভুলিয়া গিয়াছে, ঘরে আরাম-শয্যায় গর্বসুখ অনুভব করিতেছে। যে তাহার চিরদিনের সাথী, জীব তাঁহার দিকে আর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না! তাই ভগবান দয়া করিয়া তাহাকে আঘাত করেন—ঐ ঘর, অহঙ্কার, ভাঙ্গিবার জন্য, তাহাকে কাঁদাইয়া 'পথের পথিক' করিবার জন্য। দুঃখের পীড়নে সে যতই কাঁদে ততই ভগবানের গৌরব ও মহত্ত্ব তাহার কাছে প্রকাশিত হয়। জীবের এই ক্রন্দন-ধ্বনিই তাঁহার শঙ্খধ্বনি—জয়নির্ঘোষ। যখন এই শঙ্খ ধূলিপতিত থাকে তখন গৃহে মুক্ত বায়ুর সঞ্চার হয় না, বিমল আলোর উচ্ছ্বাস খেলিতে পায় না—ইহা অবসাদের অবস্থা। ইহা ত্যাগ করিয়া মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে হয়। পূজার আকাঙ্ক্ষা, শান্তির তৃষ্ণা, হৃদয়ক্ষত নিবৃত্তির আশা, ইষ্ট বস্তুর অঙ্কলিপ্সা—এ সকলই নির্মমভাবে ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইতে হয়, আবার নব যৌবনে নবীন উদ্যমে কার্যে জাগিয়া প্রবৃত্ত হইতে হয়। প্রকৃতির নিয়মে গভীর নিশীথেই এই উদ্বোধন কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। তখন ঐ ধূলিপতিত শঙ্খ উত্থিত হয় ও পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হইতে থাকে। চক্ষু হইতে নিদ্রার আবেশ কাটিয়া যায়, বক্ষস্থল পুনঃ পুনঃ আহত হয়, দীর্ঘশ্বাস বহিতে থাকে—এসব ঐ শঙ্খধ্বনির বাহ্যপ্রকাশ। এই অবস্থায় জীবকে সর্বদা রণবীর বেশে অবস্থান করিতে হয়। তীব্র আঘাতেও যাহাতে চাঞ্চল্য অথবা শৈথিল্য না জন্মায় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। সকল শক্তি সকল ঐশ্বর্য তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার জয় ও নিজের পরাজয় স্বীকার করিতে হয়, ইহাই শঙ্খের জয়ধ্বনি। যতদিন অহঙ্কার একেবারে নিরুদ্ধ না হইবে ততদিন এ সংগ্রাম নিবৃত্ত হইবার নহে। অহঙ্কারের অবসানে সংগ্রাম বিরত হয়। জীব তখন দীন, সর্বস্ব-

হীন, অকিঞ্চন, পথের কাঙাল সাজিয়া অভয় পথে পদার্পণ করে। ভগবানের অভয় শঙ্খগ্রহণই জীবনের আদর্শ। (বলাকা, ৪)

তাই দুঃখকে প্রত্যাখ্যান করিতে নাই। করিলেই ইহার মহান্ উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইয়া যায়। এই দুঃখের বেশেই জীবের কাছে ভগবানের প্রকাশ অনেকবার হইয়া থাকে। কিন্তু জীব তাঁকে অভ্যর্থনা না করিয়া বার-বার ফিরাইয়া দেয়। জীবনের প্রথম উষায় তাঁর আবির্ভাব হয়, তাঁর সঙ্গীতে জীবের সুখসুপ্তি ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু সুখমুগ্ধ জীব তা ভালবাসে না। যৌবনের সঞ্চারে প্রাণে যখন প্রেমবৃত্তি জাগিয়া উঠে তখন প্রেমের ভিখারী হইয়া তিনি আসেন। কিন্তু জীব মনে করে ইহাই কার্যের ব্যাঘাতকারক। তাই তাহা প্রত্যাখ্যান করে। তবু তিনি আসেন। মৃত্যুদূত রূপে, অস্পষ্ট দুঃস্বপ্নের ন্যায় মশাল জ্বালিয়া তিনি আবার আসেন। জীব মনে করে ডাকাত আসিল, শত্রু আসিল। অমনি হৃদয়ের দ্বার রোধ করিয়া দেয়।

এইরূপে বহুবার তিনি আসেন। কিন্তু হৃদয়ের দ্বার খোলা না পাইয়া চলিয়া যান। হৃদয়ের দ্বার বন্ধ করিয়া জীব অন্ধকারে বসিয়া থাকে। ক্রমে সময় ঘনাইয়া আসে, সকল দীপ নিভিয়া যায়, আশা ভাঙ্গিয়া যায়, চারিদিকে অকূল আঁধার ঘিরিয়া ধরে, তখন জীবনে নিজেকে বড়ই একাকী মনে হয়। প্রাণে অভাব বোধ হয়, শুধু তাহারই জন্য, যাহাকে প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। যে একদিন মোহনিদ্রা ভাঙ্গাইয়া দিতে আসিয়াছিল, একদিন প্রেমের প্রত্যাশী হইয়া হৃদয় চাহিয়াছিল, দুঃখরূপে হৃদয়কে আলোকিত করিয়া দর্প চূর্ণ করিতে আসিয়াছিল—তখন তাহারই জন্য প্রাণ কাঁদে। আবার তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে সাধ যায়। (বলাকা, ৪২)

সাগর সঙ্গীত

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আজ সত্য সত্যই দেশ-চিত্তের রঞ্জন হইয়া আবালবৃদ্ধ-বনিতার উপাসনাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার আন্তরিক স্বদেশপ্রীতি, অদ্ভুত আত্মোৎসর্গ, কঠোর আদর্শপালন এবং মহনীয় চরিত্রবল সর্বজগতের অনুকরণীয়। আজ প্রতিকণ্ঠে তাঁহার পবিত্র নাম উদ্ঘোষিত, প্রতি হৃদয়ে তাঁহার পুণ্যস্মৃতি প্রতিষ্ঠিত, প্রতি জীবনে তাঁহার ত্যাগ ও তপস্যার মহিমা প্রভাবশীল। তাঁহার উপাসনা আজ সকলেই করিতেছে। কিন্তু ইহা কর্মক্ষেত্রের কথা। কর্মবীর চিত্তরঞ্জন সর্বত্র সুপরিচিত।

কিন্তু কর্মের মূল প্রস্রবণ ভাবরাজ্য। যেখানে ভাবের প্রেরণা নাই সেখানে কর্মের বিকাশ সম্ভবপর নহে। ভাবের মধ্যে যাহাকে ধরিতে পারা যায় না তাহাকে কর্মের মধ্যে কি প্রকারে ধরা যাইবে? কিন্তু ভাবময় চিত্তরঞ্জনকে আজ কেহ দেখিতেছে না। কর্মের মধ্যে মানুষের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না, কারণ কর্ম যদিও ভাবেরই বহির্বিকাশ বটে তথাপি নানা প্রকার বাহ্য অন্তরায়বশতঃ বিকাশ পরিপূর্ণ হইতে পারে না। ভাবের পূর্ণ বিকাশ বহির্জগতে কখনই সম্ভবপর নহে। ভাবের কণামাত্র বাহিরে প্রকাশ পায়, বাকী অংশ অনন্ত সমুদ্রের মত ভিতরেই থাকিয়া যায়—বাহিরের লোক শুধু কর্ম হইতে তাহার সন্ধান পায় না।

'সাগর সঙ্গীতে' আমরা চিত্তরঞ্জনের এই ভাবময় মূর্তি দেখিয়াছি। যিনি 'সাগর সঙ্গীত' খানা আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন তিনিই ভাবুক চিত্তরঞ্জনের একটা আভাস চিত্তে প্রতিফলিত দেখিতে পাইবেন। এ মূর্তি বড় মধুর ও হৃদয়স্পর্শী। দেখিলে আর ভুলিতে পারা যায় না।

'সাগর সঙ্গীতের' দোষগুণ বিচারে আমাদের প্রবৃত্তি নাই, সে শক্তিও নাই—আর প্রয়োজনও দেখি না। কাব্যাংশ লইয়া আড়ম্বর সহকারে সমালোচনা আমরা করিব না। যে গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে প্রাণ শীতল হইয়া আসে, মস্তক ভক্তিভারে নম্র হইয়া যায়, হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলি কুসুমের মতন ফুটিয়া উঠে, জীবনে ক্ষণেকের জন্য নববসন্তের সঞ্চার হয়, তাহার সমালোচনা

করিবার মতন দুঃসাহস আমার নাই। অর্ঘ্যদানেই যেখানে তৃপ্তি সমালোচনা সেখানে সুদূরপরাহত।

তবে এই গ্রন্থ আমার কেমন লাগিয়াছে, আমি ইহার কতটুকু এবং কি বুঝিয়াছি তাহাই সংক্ষেপে বলিতে চেষ্টা করিব।

বাংলা সাহিত্যে কাব্য অনেক আছে, সৎকাব্যও কম নাই, কিন্তু আমার মনে হয় যে সুর চিত্তরঞ্জনের কণ্ঠে বাজিয়াছে সে সুর অন্যত্র বড একটা শুনিতে পাওয়া যায় না। সাধকের প্রাণে কবির কণ্ঠ সংযুক্ত হইলে যাহা হওয়া স্বাভাবিক তাহাই হইয়াছে। এরূপ মণিকাঞ্চন সংযোগ বিরল।

কাহার প্রাণে 'সাগর সঙ্গীত' কোন্ তারে কি সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে তাহা জানি না। কিন্তু আমার বোধ হয় এই মধুর কাব্যগ্রন্থের প্রতি কবিতাটি সাধনরাজ্যের কথা, এবং আমার বিশ্বাস কবি নিজেও এ বিষয়ে কতকটা ইঙ্গিত দিয়াছেন। যাঁহারা মনে করেন সাধনার বস্তু কাব্যের বিষয়ীভূত হইতে পারে না, তাঁহাদের কল্পনা সর্বথা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। যদি পুষ্পের শোভা, আকাশের নীলিমা, শিশুর মুখকান্তি, সতীর সতীত্বগৌরব, দয়া, প্রেম, সরলতা, আত্মবিসর্জন, হৃদয়ের ভাবশবলতা—এই সকল বিষয় কবিতার অবলম্বন হইতে পারে তবে অনন্ত সৌন্দর্য, অতুলনীয় মাধুর্য, অপ্রতিহত শক্তি ও পূর্ণ জ্ঞানময় পুরুষের সহিত তাঁহারই অংশস্বরূপ ও সর্বপ্রকারে তাঁহারই অনুরূপ হইয়াও মায়ার প্রভাবে আত্মবিস্মৃত জীবের অনন্ত লীলা-বৈচিত্র্য—ইহাই কি কবিতার বিষয় হওয়ার যোগ্য নয়? ভক্তির সহিত সম্বন্ধ থাকিলে যে-কোন সাধনাই কাব্যের বিষয় হইতে পারে। ভাব ও রস কাব্যের প্রাণ। যেখানে প্রাণ আছে সেখানে তদুপযোগী দেহসংঘটন প্রাকৃতিক নিয়মে আপনিই হইয়া থাকে। হৃদয় যেখানে রসসঞ্চারে সিক্ত, কণ্ঠে বাক্যস্ফূর্তি থাকিলে সাধক সেখানে স্বভাবতঃ কবি ভিন্ন অন্য কিছু নহে। আর বাক্যস্ফূর্তি না থাকিলেও সাধককে তখন 'নীরব কবি' বলিতে পারা যায়। রচনা শুধু কবিত্বের প্রকাশ, কবিত্ব বাস্তবিক পক্ষে ভিতরের বস্তু। তবে যেখানে শুষ্ক আচার বা অনুষ্ঠানের পালন ব্যতীত অপর কিছু নাই, যেখানে বিধিনিষেধ আছে কিন্তু ভাবের সংযোগ নাই—সেখানে কবিত্বের ব্যপদেশ সম্ভবে না।

* * *

'সাগর সঙ্গীত' খানা মানুষের জীবনের অর্ধাংশের ইতিহাস। মানুষ

কোথা হইতে আসিয়াছে সে আলোচনার প্রয়োজন নাই—সে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারগর্ভ হইতে উঠিয়াছে কিংবা অসীম আলোকের রাজ্য হইতে নামিয়াছে তাহার বিচার অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু সে যখনই জীবরূপে খণ্ডসত্তা ধারণপূর্বক প্রকাশমান হইয়াছে, তখন হইতেই সে একটা বিশাল ব্যাকুলতা ও পিপাসা লইয়া প্রকট হইয়াছে। জন্মের পর জন্ম, শতাব্দীর পর শতাব্দী, যুগের পর যুগ সে কিসের টানে উদাস প্রাণে বাহিরে বাহিরে ঘুরিতে থাকে। কিন্তু কোথাও কাম্য বস্তু পায় না। প্রাণে অতৃপ্তি ও অশান্তি প্রবল হইয়া উঠে। এই ভাবে চলিতে চলিতে কাল পূর্ণ হইলে একদিন হঠাৎ সে একটা পরিবর্তন অনুভব করে—যেন একটি নূতন জগতের আভাস তাহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। তখন হইতেই তাহার নবজীবনের প্রারম্ভ হয়—জীবনের প্রথমার্ধের অবসানে দ্বিতীয়ার্ধের সূত্রপাত হয়। জীব এখন সাধক, অর্থাৎ জ্ঞাতসারে সাধক, কারণ অজ্ঞাতসারে সকল জীবই চিরদিনই সাধক ভিন্ন আর কিছু নহে। এই মুহূর্ত হইতে চরম বিশ্রাম পর্যন্ত সমগ্র পন্থাটি সাধকের সাধ্যলাভ করিয়া সিদ্ধ হওয়ার ইতিহাস। সাধনার (স্থূলতঃ) প্রথম উন্মেষ হইতে পূর্ণসিদ্ধি পর্যন্ত চিত্তের অবস্থাপর্যায় যাহা স্বভাবতঃই ফুটিয়া উঠে, তাহারই কয়েকটি এই অপূর্ব কাব্যগ্রন্থে ভাবময় বাণীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

মানুষ যাহাকে চায় সেও মানুষকে চায়। মানুষ অন্ধ, বধির বলিয়া তাহা বুঝিতে পারে না। তাহার মনে হয় সে বড একা, বড নিঃসঙ্গ, বড় অসহায়। কথাটি সম্পূর্ণ সত্য, কঠোর ভাবেই সত্য, আবার সম্পূর্ণই মিথ্যা। জীবের নিত্য সাথী অবশ্যই আছে, কিন্তু জীব মোহাবরণে আত্মবিস্মৃত বলিয়া তাহার কথা ভুলিয়া গিয়াছে—সে যে তাহার প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা তাহা আর মনে পড়ে না; জীব তাহাকে ভুলিয়াছে বটে, কিন্তু সে জীবকে ভুলে নাই, সে সর্বদাই মোহনিদ্রিত জীবের শিয়রে তাহার অনিমেষ প্রেমময় দৃষ্টি স্থাপনপূর্বক জাগিয়া রহিয়াছে। শুধু জাগিয়া নাই, অবিরাম তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিতেছে—অনুদিন অনুক্ষণ সে গম্ভীর অনাহত বাণী তাহার অন্তরাকাশে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে।, তবু মোহহত জীবের কুহক ভাঙ্গে না! জীব তার জন্য কতটুকু কাঁদিতে পারে? সে যে তাহার অনন্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া তাহারই প্রতীক্ষায় যুগযুগান্তর ধরিয়া বসিয়া আছে। ক্ষুদ্র জীব আপনার সহস্রধা বিক্ষিপ্ত চিত্তে সে অনন্ত বেদনার রহস্য কি বুঝিবে?

বুঝে না বটে, কিন্তু হঠাৎ এক শুভ মুহূর্তে সে ডাক শুনিতে পায়—ভিতর দিকে অন্তর রাজ্যে অনন্ত সমুদ্রের ঘোর গর্জন একদিন তাহার প্রাণে বাজিয়া উঠে আর তাহাকে আকুল করিয়া তোলে। সদ্‌গুরুর কৃপায়, ভক্তসংসর্গে, প্রাক্তন সংস্কারের বিপাকফলে অথবা যদৃচ্ছাক্রমে এই অবস্থার বিকাশ হয়, তাহা লইয়া বিচার করা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু যাহার যে ভাবেই হউক একবার এই অবস্থার বিকাশ হইলে মানুষের চিত্ত আর বাহিরে ছুটাছুটি করিতে ভাল বাসে না, পারেও না। কেমন একটা আনমনা ভাবের উদয় হয়, সব হৃদয়মন যেন নেশায় বিভোর হইয়া পড়ে, আপনাতে আপনি ডুবিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। যে চিত্তক্ষেত্র এতদিন অন্ধকার আবরণে আচ্ছন্ন ছিল, এই নাদধ্বনি শুনিতে শুনিতে তাহা অপূর্ব জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে, দেহমধ্যে কখনও কখনও অশ্রু রোমাঞ্চাদি সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। এই অবস্থায় অনন্তের একটা ক্ষীণ আভাস প্রাণে ফুটিয়া উঠে—ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের সীমাজাল ভাঙ্গিয়া সুখ-দুঃখ অসীম মুক্ত আকাশে উধাও হইয়া উঠিতে চায়। কিন্তু তখনও চিত্তে জ্ঞানের বিকাশ হয় নাই বলিয়া ঠিক বোধটি জাগে না। তবু এটা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে মানুষের সুখেরও সীমা নাই, দুঃখেরও অন্ত নাই—অথচ অসীমের রাজ্যে যাইয়া সুখ-দুঃখ উভয়ই যেন নূতন সার্থকতা লাভ করে, উভয়ের মধ্যে একই অপূর্ব আনন্দমাধুরী যে নানারঙ্গে খেলা করিতেছে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। সুখের মাধুর্য যেমন, দুঃখেরও তেমনি---এই মাধুর্যের ভারে হৃদয় অবনত। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও প্রাণ অধীর হইয়া উঠে। কারণ চিত্ত সঙ্গহীন। সুখ-দুঃখ যাহার চরণে সমর্পণ করিয়া জীব বিশ্রাম লাভ করিবে এখনও যে সে আত্মপ্রকাশ করে নাই।

কোথায় রাখিব আজ এ সুখের ভার,
কারে দিব আজ মোর অশ্রু উপহার! (৪)

সত্যই কবির নেত্র আজ অনন্তের স্বপ্নাবেশে আবিষ্ট—অন্তরে আজ সঙ্গীতের প্রস্রবণ বহিতেছে, তাই সর্বত্রই সঙ্গীত ও সৌন্দর্যের উৎস খুলিয়া গিয়াছে। সাধকের সাধন-জীবনের প্রথমাংশ এই ভাবেই কাটে। বিশ্ব-ভুবনের মর্মস্থলে যে অনাদি সঙ্গীতধারা দূরাগত বিলাপধ্বনির মতন শ্রোতার মন উদাস করিয়া, আকর্ষণ করিয়া অনন্ত নীরবতার মধ্য দিয়া অকূলের পানে বহিয়া চলিয়াছে তাহা একবার শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হইলে জীবনের গতি ফিরিয়া

যায়, দৃষ্টি বিকশিত হয়, হৃদয়ে স্বচ্ছতা আসে ক্রমে কর্তৃত্ববোধ শিথিল হইয়া পড়ে---তখন নিজেকে, নিজের মনকে বিশ্বশিল্পীর করস্থ যন্ত্র অথবা লীলাময়ের ক্রীড়াকন্দুক বলিয়া বুঝিতে পারে ও তাহাতেই প্রকৃত গৌরব অনুভব করে। কবি বলিয়াছেন—

আমার জীবন লয়ে কি খেলা খেলিলে !
আমার মনের আঁখি কি ভাবে খুলিলে !
আমার পরাণ ছিল কুঁড়ির মতন,
তোমার সঙ্গীতে তারে ফুটালে কেমন ! (৯)

অনন্তের আভাসে হৃদয়, মন, এমন কি সমগ্র জীবন কোরকাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া অনায়াসে বিকচ কুসুমের প্রাণোন্মাদী সৌরভ ও রূপলাবণ্যে পরিণাম লাভ করে। যেখানে যা কিছু সুন্দর আছে সেই গানের সুরে তার আবরণ ছিন্ন হইয়া যায়। মোহান্ধ "মনশ্চক্ষুঃ" আপনিই উন্মীলিত হয়—কিছুরই জন্য চেষ্টা আর থাকে না। অনন্ত যখন প্রেমভরে সান্তের সঙ্গে খেলিতে আরম্ভ করে তখন যাহা অতি দুঃসাধ্য তাহাও সহজ হইয়া পড়ে।

প্রশ্ন হইতে পারে—জগতে কত মধুর স্বরলহরীই ত শুনিয়া থাকি, কিন্তু তাহা হইতে এ সাগর-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য কোথায় ? উত্তর সহজ। এ শব্দের মোহিনী শক্তি অসীম। এই সঙ্গীতই বাহ্য বায়ুর সংস্পর্শে ভেদ প্রাপ্ত হইয়া অনন্ত বিচিত্র আকারে শ্রুত হয় সত্য, কিন্তু সূক্ষ্ম বায়ুস্তরে, স্তিমিতবায়ুর রাজ্যে যে অখণ্ড ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় তাহার আকর্ষণশক্তি সীমাহীন। শ্যামের বাঁশীতে সত্যই যমুনা উজান বহে, বৃত্তিপ্রবাহ স্বতঃই উর্ধ্বদিকে উৎসারিত হয় ; জগতের যাবতীয় বহিঃস্পন্দন নিস্তব্ধ হইয়া যায়। প্রসিদ্ধি আছে—

নাদগ্রহণতশ্চিত্তমন্তরঙ্গভুজঙ্গমঃ।
বিস্মৃত্য বিশ্বমেকাগ্রঃ কুত্রচিন্ন হি ধাবতি ॥
মনোন্মত্তগজেন্দ্রস্য বিষয়োদ্যানচারিণঃ।
নিয়মনসমর্থোঽয়ং নিনাদো নিশিতাঙ্কুশঃ ॥
নাদোঽন্তরঙ্গসারঙ্গবন্ধনে বাগুরায়তে।
অন্তরঙ্গসমুদ্রস্য রোধে বেলায়তেঽপি বা ॥

মন তখন বাগুরাবদ্ধ হইয়া স্থির হয়, সঙ্গে সঙ্গে অসীমের ছায়া বুকে ভাসিয়া উঠে। কারণ জীবের সীমাবদ্ধ ব্যক্তিত্বের অন্তরালে অনন্ত ব্যাপ্ত রহিয়াছে। সেইজন্য ঐ গানে যতই এই আড়াল সরিতে থাকে ততই আত্মস্বরূপের স্ফুরণ হইতে থাকে। অনন্ত হইতে প্রেরিত এই নাদের প্রভাব ভিন্ন অনন্তের আবরণ উন্মোচন সম্ভব নহে।

আমার অন্তরতলে মুক্ত চিদাকাশ,
অনন্তের ছায়াভরা আমার পরাণ!
সাড়া পাই তারি আমি সঙ্গীতে তোমার
প্রভাতের আলো মাঝে, সাঁঝের আঁধারে। (৭)

এই গানে আপনা হারাইয়া যায়, সমস্ত জগৎ ডুবিয়া যায়, দেশে ও কালে তল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হয়। একদিন সমস্ত বিশ্ব বিলীন হইয়া চারিদিকে—অন্তরে বাহিরে—মহাশূন্য প্রকাশ পায়, সেই অনন্ত শূন্য বক্ষে শান্তিময় হাস্যের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাজাল বিকীর্ণ করিয়া স্বপ্নের ন্যায় পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়, ইষ্টদেবের একটা অস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি চিদাকাশে ফুটিয়া উঠে। তাহার মাধুরী কত গভীর তাহা বর্ণনা করা যায় না। সেই মায়াময় ছায়াময় স্বপ্নবৎ সুমধুর আলোকে একটি অপরূপ ইন্দ্রজাল রচিত হয়। জীবনের বিস্মৃতি ভাঙ্গিয়া সহস্রজন্মের হাসিকান্না সুখদুঃখের স্মৃতি অস্ফুটভাবে ঠেলিয়া উঠে—অতীত জীবনখানা যেন একটি স্বপ্নময় চিত্রপটের ন্যায় বর্তমানের সহিত একাকারভাবে ভাসিতে থাকে।

সাধকের প্রথমাবস্থার এই খানেই অবসান (১—১২)। ঐ যে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইল, সমস্ত হৃদয় তাহার স্নিগ্ধ করলহরীতে ভাসিয়া গেল—এ সত্যই একটি অপূর্ব ইন্দ্রজাল, সাধককে অনাবৃত আত্মস্বরূপের একটু ক্ষীণ ছায়া দেখাইয়া তাহার মনকে প্রলুব্ধ করিবার একটা কৌশল মাত্র। এই শশাঙ্কখচিত পূর্ণিমা যামিনী—ইহা যে চিরস্থায়ী নহে, সাধক তাহা অবিলম্বেই অশ্রুসিক্ত নয়নে দেখিতে পায়। অভাবের ভিতর দিয়া না গেলে ভাবের সঙ্গে সম্যক্‌ পরিচয় হয় না, দুঃখদাবানলে বিদগ্ধ না হইলে আনন্দের অমৃতকলার শীতস্পর্শ অনুভবে আসে না—ইহা সাধনজীবনের সর্বসম্মত একটি সিদ্ধান্ত। কিন্তু তাই বলিয়া প্রথমেই এ অভাব আসে না। কারণ পরমসৌন্দর্যের একটু

আভাসও যদি স্মৃতিরূপে হৃদয়ে ধারণ করিয়া না রাখা যায় তবে দীর্ঘ বিরহাবসর কাহার চিন্তায় কাটিবে? তাই চিরসুন্দর আপন অনন্ত সৌন্দর্যের কণামাত্র চিত্তে সঞ্চার করিয়া তাহাকে বিমুগ্ধ করিয়া আকৃষ্ট করিয়া পরে তাহাকে অন্ধকারমধ্যে আত্ম-শোধনের জন্য নিক্ষেপ করেন! আলোক না পাইলেও ঐ আলোকের স্মৃতিটুকু লইয়াই সাধক তখন দীর্ঘ আঁধার নিশি কাটাইতে পারে।

আজি মেঘপূর্ণ দিন ধূসর আঁধার!
তরঙ্গ তরঙ্গপরে ঝাঁপায়ে পড়িছে,
অশান্ত বেদনা ভরে দুলিছে ফুলিছে,
কাঁপিছে গর্জিছে যেন মহাহাহাকার! (১৩)

এই অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি গাহিয়াছেন—
এই যে রুদ্রলীলা, প্রিয়তমের এই যে সংহার-মূর্তি, ইহার কি কোনই অর্থ নাই? এই নিষ্ঠুরতা কি সত্যই নিরবচ্ছিন্ন নিষ্ঠুরতা? কবি বুঝিতে পারিতেছেন না—
একি সুখ? একি দুঃখ,···প্রণয় গভীর একি?

গভীর জিনিস এইপ্রকারই হইয়া থাকে। সীতার অঙ্গস্পর্শে শ্রীরামচন্দ্রও একদিন বুঝিতে পারেন নাই—

বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
প্রমোহো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।

ঘোর অন্ধকার নিশীথে, মেঘাড়ম্বর ও বজ্রধ্বনির মধ্যে, প্রলয়ঝঞ্ঝা ও মরণোচ্ছ্বাসের উত্তাল তরঙ্গে কালভৈরবের ভীষণ হুঙ্কার ও নিশাচরের বিকট নৃত্য জীবের আরাম-প্রিয়তা ও ক্ষুদ্র অহঙ্কারের নাগপাশ কাটিয়া দেয়। এই ঘোর ঝটিকাঘাতে সাধকের পাল ছিঁড়িয়া হাল ভাঙ্গিয়া যায়, আমিত্বরূপ তরণী অগাধ প্রলয়পয়োধিনীরে, আশ্রয়হীন অসীম অন্ধকার সমুদ্রে নির্বাণোন্মুখ হয়। সাধক তখন যুক্তকরে "তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ" বলিয়া শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আপনার স্বাধীনতা, পুরুষকার সমস্ত বিসর্জন দেয়, তাঁহার নিকট যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে। মানুষের আত্মম্ভরিতা ও দর্প এই ভাবে চূর্ণ হইয়া যায়—সে বুঝিতে পারে মরণকে সাদরে আবাহন করিতে না পারিলে অমৃতলাভের অধিকার জন্মে না।

যখন ক্রমশঃ এইভাবে হৃদয় বিনম্র হইয়া আসে তখন রণকোলাহল নিবৃত্ত হয়, প্রকৃতি শান্তিময় মূর্তি ধারণ করেন, অন্তরে বাহিরে সাম্যভাব প্রতিষ্ঠিত হয়, কোনপ্রকার বিরোধ আর থাকে না। সেই অবস্থায় কবি বলিতেছেন—

আমার পরাণ তরে বৃথা যুদ্ধ করা
আমি তো আপনা হতে দিতেছিনু ধরা !
জ্বেলে দিব সন্ধ্যাদীপ তোমার পরাণে
হৃদয় মন্দির তব ভরি দিব গানে।
পাতিব তোমার তরে শয্যা সুশীতল
তোমার চরণতলে রবে শান্তিজল। (১৮)

রুদ্রের ভৈরব মূর্তির অন্তরালে যে শান্তিময় প্রিয় মূর্তি গুপ্ত ছিল এইবার তাহা প্রকট হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সাধনমার্গের দ্বিতীয় স্তর কাটিয়া গেল।

এখন সাধক মৃত্যুরাজ্য অতিক্রম করিয়া অমৃতের দেশে পুনরায় পদার্পণ করিয়াছে। এবার প্রভু সাধকের হৃদয়রূপ নন্দনকাননে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন —চতুর্দিক মৃদুমারুতহিল্লোলে নানাপ্রকার কুসুমের সৌরভে আমোদিত, প্রাণ আনন্দে মাতোয়ারা। এত দুঃখের পর জীব মনে বড় আশা করিয়া বসিয়া আছে—প্রভু এখনি এই সঙ্গীতময় পুষ্পময় লীলাকাননে তাহাকে ডাকিয়া লইবেন।

এই আশা লইয়া থাকিতে থাকিতে একদিন সাধক সত্যই তাঁহার দর্শন পায়—অপূর্ব জ্যোতির্মণ্ডিত তরুণ দেহ মণিরত্নময় নানা বিভূষণে অলঙ্কৃত,— দোলায় দোদুল্যমান প্রেমময় দিব্য রাজমূর্তি। দর্শনমাত্রেই প্রাণে বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলিতে থাকে, চিরজীবনের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষারাশি প্রবল হইয়া উঠে।

ইষ্টদেবতার প্রথম সন্দর্শনে সাধকের হৃদয়ে যে অপূর্ব ভাবের বিকাশ হয় তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝান কঠিন। একটা তীব্র মাদকতা, একটা ভাষাহীন প্রবল আবেশ প্রাণকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে—কিন্তু তাহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করা সহজ নহে।

তবে এ কথা সত্য যে, সে ভাবের মধ্যে আনন্দ ও বিষাদ উভয়ের সমাবেশ আছে। কেহ যেন মনে না করেন শ্রীভগবানের আভাস দেখিয়া মানুষের হৃদয়ে

বিষাদের সঞ্চার হওয়া অস্বাভাবিক। সাধনার উচ্চস্তরে উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দ ও বিষাদ উভয়ই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। চিত্ত স্বচ্ছ হইলে সাধক জগতের সুখদুঃখের অতীত হইয়া আপন স্বরূপানন্দে মগ্ন হন—কিন্তু ঠিক তখনই আবার এই স্বচ্ছতাবশতঃ জগতের সুখদুঃখ তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয়। বোধিসত্ত্ব, খৃষ্ট, গান্ধী—ইঁহাদের মতন দুঃখী কে? ইঁহাদের চিত্ত জগতের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিয়াছে বলিয়াই জগতের দুঃখ তাহাতে উদিত হয়। কিন্তু এ দুঃখ লৌকিক বা ব্যক্তিগত দুঃখ নহে। তাদৃশ সুখদুঃখের সম্ভাবনা তাঁহাদের নাই —যে নির্ম্মল আনন্দে শুদ্ধসত্ত্ব মহাপুরুষগণ প্রতিষ্ঠিত থাকেন তাহা ইন্দ্রিয়জন্য কিংবা মানসিক সুখদুঃখের বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যে জীবে দয়ার মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহার মূল প্রস্রবণ এই সর্ব-ব্যাপকদুঃখের অনুভূতি। বৈষ্ণবের ভাষায় যাহা জীবে দয়া, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ভাষায় তাহাই "করুণাপুণ্ডরীক"। সাধনরাজ্যে অগ্রসর হইতে হইতে স্বার্থবিলোপ ও পরার্থবোধের উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই পুণ্ডরীক বিকশিত হইয়া উঠে। একদিন যে নিজের ক্ষুদ্র সুখদুঃখের গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল, তখন সে নিজেকে ভুলিয়া বিশ্বজগতের দুঃখে অভিভূত হইয়া করুণায় বিগলিত হইয়া যায়—এই "sad music of humanity" তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাহাকে বিবশ করিয়া ফেলে।

যোগভাষ্যকার ব্যাসদেব বলিয়াছেন—

প্রজ্ঞাপ্রাসাদমারুহ্য অশোচ্যঃ শোচতো জনান্।
ভূমিষ্ঠানিব শৈলস্থঃ সর্ব্বান্ প্রাজ্ঞোঽনুপশ্যতি॥

পর্বতের তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে নিম্নে দৃষ্টিপাত করিলে যেমন ভূমিস্থ উচ্চ ও নীচ সকল বস্তুই সমতল বোধ হয়, প্রজ্ঞার চরমসীমায় উপনীত হইয়া—স্বয়ং শোকাতীত হইয়া—শোকতাপে নিমগ্ন জগতের দিকে লক্ষ্য করিলেও প্রাজ্ঞ সাধক, সেই প্রকার সর্বত্রই সমান দুঃখ দেখিতে পান। বুঝিতে পারেন একটা দুঃখেরই একটানা স্রোত ভিতরে বাহিরে উপরে নীচে সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র সমভাবে প্রবাহিত রহিয়াছে। এই জগন্ময় বিরাট দুঃখ প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে ও হৃদয়ে করুণভাবের সঞ্চার হয়।

ভগবানের রাজবেশ দেখিয়াও সাধক আজ তাই করুণভাবে অভিভূত—

আজি যে আকাশ গাহে করুণ সুরে !
হৃদয় উদাস করা করুণ সুরে !
মেঘেরা কি কথা কহে, বাতাস কাঁদিয়া বহে
সাগর চুমিয়া আর গগন ঘুরে—
করুণ সুরে।
আজি যে পরাণ মোর বাজিয়া উঠেছে ঘোর
করুণ সুরে।
কিবা খোঁজে কিবা চায়, কোথা থাকে কোথা যায়
দূরে অদূরে ! (২১)

এই যে জগৎ ইহা ত' সেই অনন্তেরই একদেশ মাত্র। সুতরাং এ দুঃখও সেই অনন্তেরই হৃদয়বেদনা। সত্যই অনন্তের মর্মস্থলে অনন্ত প্রকার ঐশ্বর্য ও আনন্দের মধ্যেও যে অনন্ত আর্তি অনন্তকাল ক্ষুধাতুর শিশুর মতন গুমরিয়া কাঁদিতেছে, বাহ্যজগৎ সে সংবাদ রাখে না। শুধু অন্তরঙ্গজন—যে অনন্তের প্রিয় সঙ্গী সেই—জানে যে, রাজরাজেশ্বরও কাঙ্গাল বটে, ভগবান্‌ও ভিখারী বটে। সেই অসীম প্রেমময়ের বুকভরা বেদনা—অনন্তক্রন্দনধারা, বিরাট ক্ষুধা, অতৃপ্ত পিপাসা চির-অজ্ঞাত। যে অনন্তের অন্তরস্পর্শী নহে সে এ-ব্যথার পরিচয় পায় না। কিন্তু অন্তঃপুরে যে সাধক প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহার প্রেমবিদগ্ধ দৃষ্টিতে কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। ভালবাসার চক্ষু অতি তীক্ষ্ণদর্শী। কবি বলিতেছেন—

ওগো কতকাল ধরে বহিতেছ তুমি
এ গীতবেদনারাশি হৃদয় ভরিয়া।
কত জন্ম জন্মান্তর, কত যুগ যুগান্তর।
ওগো কত যুগ হতে ও চিত্ত চুমি
এ গান ধ্বনিছে বিশ্ব পাগল করিয়া।
কত যুগ যুগান্তর, কত জন্মজন্মান্তর।
হে অনাদি, হে অনন্ত, তব ব্যাপ্ত মহিমায়
এ চির ক্রন্দনধারা কেমনে বহিয়া যায়।

কাঁদিতেছে একি ক্ষুধা একি তৃষ্ণা অনিবার !
একি ব্যথা গরজিছে শ্রান্তিহীন দুর্নিবার !
কত জন্ম জন্মান্তর কত যুগ যুগান্তর। (২৮)

সান্তের জন্য অনন্তের এ ক্রন্দনধ্বনি জগৎ জুড়িয়া জাগিয়া উঠিয়াছে—সান্তকে বক্ষে টানিয়া নিলে তবে এ ক্রন্দনের অবসান হইবে। এ বেদনা বিরহের যন্ত্রণা, অপরিচয়ের মিলন এবং পরিচয় না হওয়া পর্যন্ত ইহার উপশম নাই।

সত্যই পরিচয় এর নাই। না জীব ঈশ্বরকে চিনিয়াছে, না ঈশ্বর জীবকে চিনিয়াছেন। অবশ্য জীব রাজবেশে ইষ্টদেতার সন্দর্শনলাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু সে দর্শন পূর্ণ নহে। ছিন্নকন্থা পথের ভিখারীর সঙ্গে নানারত্নমণ্ডিতকায় রাজরাজেশ্বরের সাক্ষাৎকার—এখানে যে উভয়ের মধ্যে পরিচয়ের সম্ভাবনাই নাই তাহা বলা বাহুল্য। কাঙ্গালের সঙ্গে কাঙ্গাল না হইয়া, রাজার সঙ্গে রাজা না হইয়া, মিলন সম্ভবপর নহে। জীব যতটুকু দর্শন পাইয়াছে তাহাতে ভগবানের কাঙ্গাল বেশ দেখিতে পায় নাই, কিংবা তাহার নিজেরও রাজবেশ প্রাপ্তি ঘটে নাই। সুতরাং এখনও উভয়ে প্রকৃত মিলন হইতে পারে না।

জীবের দর্শন অপূর্ণ—কারণ রাজেশ্বরের অন্তস্তলে যে ভিখারী সাজে দীনহীন কাঁদিতেছে তাহা সে দেখে নাই। যে ঈশ্বর হইয়াও কাঙ্গালী, তাহার ঐশ্বর্য দেখিয়া আমরা ভ্রমবশতঃ মনে করি তাহাকে চিনিয়াছি। ঐশ্বর্য বাহ্যবিভূতি—অঙ্গের আভূষণ। কিন্তু এই ঐশ্বর্যের অন্তরালে তাঁহার যে মাধুর্য ও দৈন্যময় স্বরূপখানি ঐশ্বর্যলিপ্সুর দৃষ্টির অগোচর থাকিয়া যায় তাহাও ত দর্শনীয়। যেমন এই ঐশ্বর্যের লেশমাত্র জগতে প্রকাশ পায়, তেমনি এ মাধুর্য দৈন্যেরও তাহাই। জগতে যত দুঃখ, যত বেদনা সব সেই অনন্ত বেদনারাশির এক কণিকা মাত্র। প্রিয়জনের সঙ্গে মিলন—তখন সে মিলন কেবল সুখে আবদ্ধ থাকে না, দুঃখেও আত্মপ্রকাশ করে।

কিন্তু অনন্তের আবার দুঃখ কিসের জন্য ?—সান্তের জন্য। যদিও অনন্ত সান্তকে বক্ষে ধ'রয়া আছে, যদিও সান্ত কদাপি অনন্তব্যতিরেকে আপন সত্তা প্রকাশ করিতে পারে না, তথাপি সে তাহা বুঝিতেছে না। সে ভাবিতেছে সে বিরহী, সে একাকী, সে নিঃসঙ্গ। তাই তাহারই ফলে অনন্তও বিরহাতুর।

উভয়ের মিলনে, অর্থাৎ সান্তের যখন বিরহভ্রম কাটিবে তখন অনন্তের এ বেদনার অবসান হইবে। জীব অনন্তকে ভালবাসে, তাই তাহার প্রাণনিহিত জগন্ময় বেদনা আপনি নিতে চায়। নিজেও অনন্তেরই গান—জগতের দুঃখে করুণাগীতিলহরী—মনে প্রাণে গাহিয়া বেড়াইতে চায়—

আজ হতে আমি, হে অর্ণব! হে অশেষ!
গাহিব তোমার গান ফিরি দেশ দেশ।

বস্তুতই জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ প্রেমের সম্বন্ধ, সখ্যের সম্বন্ধ। কবি বলিয়াছেন—

'আমি আছি তব ছোট ভাইটীর মত (২৫)'।

সেই যে উপনিষদে "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে"—একটি বৃক্ষে দুইটি সখ্যভাবাপন্ন বিহঙ্গমের দৃষ্টান্ত দ্বারা সমানাধিকরণ অথচ ভিন্নধর্মাক্রান্ত দুইটি তত্ত্বরূপে জীব ও ঈশ্বরের রূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহার স্মরণ হয়। এক মহাশক্তি হইতে ঈশ্বর ও জীব উভয়ে সত্তা লাভ করিয়াছে—একটি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি, অপরটি অল্পজ্ঞ ও অল্পশক্তি। এক মূলস্থান হইতে প্রকটিত বলিয়াই উভয়ে প্রেমের সূত্রে সংবদ্ধ—সেই মহাশক্তিই জীব ও ঈশ্বর দুইয়েরই যোগস্থল। কবি কখনও তাহাকে "পরপার" বা "ওপার" বলিয়াছেন, কখনও 'মহাশবদের নিত্যধাম' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা যে নিত্য, আদ্যন্তবিহীন তাহা তিনি স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন—

অনাদি অনন্ত নিত্য মহাপ্রাণ হ'তে
দুজনে এসেছি যেন দুটি প্রাণ স্রোতে!
তারপর কতবার জনমে জনমে
আমরা মিলেছি দোঁহে মরমে মরমে,
কতবার ছাড়াছাড়ি মিলেছি আবার
তুমি আর আমি আজ ওগো পারাবার! (২৯)

সেই প্রথম (?) আবির্ভাব হইতে আজ পর্যন্ত কতবার মিলন, কতবার বিরহ সংঘটিত হইয়াছে—কিন্তু যাহা পরমা শান্তি তাহার উপলব্ধি এখনও হয় নাই।

* * *

তুমি ভেসে যাও সখা! অনন্তের পানে!
আমি যে ভাসিছি শুধু তোমারি এ গানে।

যে অনন্তের সঙ্গে ইষ্টদেবতার যোগ রহিয়াছে আজ ইষ্টগতপ্রাণ সাধকের মধ্যেও সেই অনন্তের ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে—হৃদয়ে বিশালতা নামিয়া আসিতেছে। এখনও আঁধার কাটে নাই, পরিচয়ের স্ফুটালোক এখনও উদিত হয় নাই—এখনও অন্তরের রূপ দর্শন হয় নাই। কিন্তু জগতের সকল সুখ ও সকল দুঃখ যেন সাধককে অস্পষ্টভাবে হৃদয়ে পীড়ন করিতেছে। যদিও এখনও তিনি শব্দের অতীত হইয়া শাশ্বতপদ প্রত্যক্ষ অনুভব করেন নাই, তবুও একথা সত্য যে, বর্তমান অবস্থায় তিনি শব্দের মধ্যেই শান্তকে -"শব্দাতীত বাণী"কে—আভাসে বুঝিতে পারিতেছেন। আভাস বটে, কিন্তু এই আভাসেই তাঁহার সাধের খেলা-ঘর, কৃত্রিম প্রকাশে প্রকাশমান স্বপ্নময় চিত্ররাজি, ভাঙ্গিয়া গেল। অনন্তকে ভুলিয়া ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ পুত্তলিকা লইয়া জীব খেলিতে থাকে, তাহাতেই প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া কারাগৃহে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখে—কিন্তু সে কতক্ষণ? ইষ্টদেবতা যে পরিচ্ছিন্ন নয়, উপাস্য যে সসীম নয়, একদিন তাহা সে অবশ্যই বুঝিতে পারে। মহাসমুদ্রের জলরাশি জোয়ারের বেগে গভীর গর্জনে যখন শুষ্কপ্রায় তটিনীতে অকস্মাৎ সঞ্চারিত হইতে থাকে, তখন বন্যাপ্লাবনে দুকূল ভাসিয়া যায়, তটিনী স্বয়ং মহাসাগরের বিশালতা ধারণ করিয়া অনন্তের ছায়া প্রদর্শন করে।

জীব এখন সন্ধিক্ষণে উপস্থিত—দিনের আলো ও রাত্রির আঁধার, জ্ঞাত ও অজ্ঞাত, দুইটিই এক স্থলে সম্মিলিত—'আলো অন্ধকার ঝরে তোমার সকল গায়।' কি একটি অপূর্ব অবস্থার স্ফুরণ হইয়াছে—যেন ঠিক আলোও নয়, আঁধারও নয়, যেন বায়ুর স্পন্দন পর্য্যন্ত সেখানে নিরুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, কূটস্থ সাক্ষীর অচপল নির্নিমেষ নয়নের মতন দিগন্তব্যাপ্ত ঔদাস্যময় নির্লিপ্ত চিদাকাশ যেন প্রশান্তভাবে তাকাইয়া আছে। আজ যেন ইষ্টদেবতা স্বয়ং

মহাসত্তাসাগরে বিসর্জন প্রাপ্ত হইবেন, তাই কারুণ্যপূর্ণ বিসর্জনের বাজনা বাজিতেছে—এ বাজনায় প্রাণের বিষাদ ও মনের দ্বিধা জড়িত। বিষাদ—কেন না এ সুন্দর ভুবন ছাড়িয়া, আমিত্ব ও তুমিত্ব ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, অসমাহিত জীবন-সমস্যা সঙ্গে লইয়া ছিন্নতন্ত্রী হৃদয়ের ব্যথা অনুভব করিতে করিতে যাইতে হইবে। দ্বিধা—কেন না, চলিতে মন অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া আসে, মনে হয়—'একি সত্য? একি মিথ্যা? একি আশা? একি ভয়?' অতলের মধ্যে ডুবিবার সময় প্রাণে এমনটাই হইয়া থাকে। গৌড়পাদকারিকায়, পঞ্চদশীতে বর্ণনা আছে—অনেক সাধক সবিকল্প ভূমি ছাড়িয়া নির্বিকল্পকে ঝাঁপাইয়া পড়িতে ভয় পায়, মনে করে মহাশূন্য তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে—একথা বুঝে না যে তখন মহাশূন্য স্বয়ংই পূর্ণ-স্বরূপে তিরোহিত হইয়া যাইবে।

* * *

কিন্তু তবু এ দ্বিধার মধ্যে পড়িয়া থাকিলে চলিবে না, নামিতেই হইবে। তখন সাধকের জীবনে আর এক অবস্থা জাগে। দিব্য চক্ষু খুলিয়া তাহার দর্শনও বিচিত্র হয়। সে দেখিতে পায়, বুঝিতে পারে, যে তাহার উপাস্যই পূজারী, তার আপন প্রাণ-প্রদীপই আরাতির দীপসম্ভার, তার পবিত্র হৃদয়ই ধূপবাসিত মন্দির, * তার অন্তরাকাশস্থ অনাহত ধ্বনিই আরতির শুভ শঙ্খনাদ। কিন্তু এ আরতি কাহার, পূজা কাহার? কে জানে? অনন্তের দ্বারে আসিয়া সাধক আজ আপন ইষ্টকে গুরুরূপে, ভক্তরূপে প্রত্যক্ষ করিতেছে—তাঁহার নিকট শক্তি গ্রহণ করিতে প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে।

আরতির শঙ্খ যেন উঠিল বাজিয়া
তোমার পূজার লাগি, ধূপ ধুনা দিয়া
পুণ্যধূমে সুপবিত্র হৃদয়-মন্দির!
উদাসী সঙ্গীত তব বাজিছে গম্ভীর।

---

* দ্রষ্টব্য: "শিষ্যের ভিতরে তিনি (সদগুরু) নিজের ইষ্টদেবতাকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তাঁরই সেবা পূজা করেন। শিষ্যের দেহ তাঁর দেবমন্দির। * * * সদ্গুরুপ্রদত্ত নাম—নাম নয়, অক্ষর নয়, বা একটা শব্দ নয়—এই নামই ভগবানের অনন্ত শক্তি। শিষ্যের ভিতরে এই শক্তিসঞ্চারই সদ্গুরুর দীক্ষা।" শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ, তৃতীয় খণ্ড, (১২৯৮ সাল) পৃঃ ৩০৪।

হে পূজারি! আজ তুমি কোন পূজা কর?
পরাণ-প্রদীপ মোর ঊর্দ্ধে তুলি ধর,
কার পানে, কোন মন্ত্র করি উচ্চারণ,
কোন পূজা লাগি বল এত আয়োজন?
দীক্ষা দাও ওগো গুরু! মন্ত্র দাও মোরে
পূজার সঙ্গীতে তব, প্রাণ দাও ভ'রে! (৩৩)

এবার সদ্‌গুরু-প্রদত্ত শক্তিপাতে সাধকের সমস্ত চাঞ্চল্য, সকল বাসনা কাটিয়া গেল। 'পূরবী রাগিণীর' হৃদয়উদাস-করা গভীর ঝঙ্কারে চারিদিকে বৈরাগ্যের সুর বাজিয়া উঠিল। তরঙ্গ শান্ত হইল, বায়ু স্থির হইল, আকাশের ক্ষীণ আলো নিবিয়া গেল, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী পর্যন্ত মহান্ধকারে বিলীন হইল —রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দবিহীন সেই অনন্ত ব্যোম, সেই মহাশূন্য মাত্র জাগিয়া রহিল। ঈশ্বর তখন সেই শূন্যময়, জীবও তাহাই। মনে হয় যেন সে মহানির্বাণে সকল প্রেমের অবসান, সকল কর্মের পরিসমাপ্তি। হউক না তাহা 'মায়াহীন' তবু সেটা ছায়াময়, অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা—জীব ও ঈশ্বর উভয়েরই আপনার মাঝে আপনাকে গুপ্ত বা মগ্ন রাখার অবস্থা। কবি বলিতেছেন ইহাই "যোগ।" সেই মহাশান্তি মধ্যে জগতের যত বিক্ষোভ চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সেই আনন্দে সকল বিষাদ মগ্ন হইয়া গিয়াছে।

শুধুই কি তাই?

সকল প্রকৃতি আজ পদ্ম হয়ে ভাসে জলে,
মহাকাল থেমে গেছে তোমার চরণ তলে।
আমার বক্ষের পরে যোগাসনে যোগিবর,
নিবিড় নিশ্বাসহীন ধীর স্থির আঁখি কর!

* * *

ইহাও চরমাবস্থা নহে।' কবি ভক্ত, তিনি এই অবস্থা লইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারেন না। ইহার পরে আরও সুন্দর অবস্থা আছে—লীলার প্রকাশ। এখানে তাহার আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু সন্ধান মিলে না।

পেয়েছি আভাস আমি পাইনি সন্ধান তার,
যুক্তকরে বসে আছি কর মোরে একাকার।

সুতরাং বুঝিতে হইবে এখানেও "একাকার" ভাব আসে নাই—এখনও প্রতীক্ষা। সেই একাকার ভাবেই লীলার প্রকাশ—বাহ্যভাব থাকিতে লীলায় প্রবেশ হয় না।

ক্রমশঃ এ বাহ্যভাবও কাটিয়া যায়—তখন হৃদয়ে ভক্তির কুসুম ফুটিয়া উঠে, জগৎ ভগবদ্‌ভাবে ভরিয়া যায়। তখন আর নিরোধের আবশ্যকতা থাকে না—তরঙ্গ আবার নাচিয়া উঠে, বায়ুতে আবার হিল্লোল খেলিতে থাকে, জীবনের প্রবাহ আবার তেমনি করিয়া ছুটিয়া চলে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই যেন হরিনামের কীর্তনধ্বনি, করতাল মৃদঙ্গের মধুররোল, শুনিতে পাওয়া যায়।

সাধন ভজনে আজি কুসুম উঠেছে ফুটি
সকল গগন ভরে! তোমার নয়ন ছুটি
ভক্তি-রসে ঢুলু ঢুলু! বিগলিত করুণায়
তোমার তরঙ্গদল নেচে নেচে বহে যায়।
গগন ভরিয়া গেছে সঘন গম্ভীর বোলে
চরাচর ছেয়ে আছে মধুর কীর্তন রোলে। (৩৬)

চারিদিকের অপার মাধুর্যের মধ্যে ভক্তের হৃদয়ে তখন বিরহরস জাগিয়া উঠে—

দেবতার তরে আজি আবার আকুল হিয়া
ঢেকেছ-ঢেকেছ মরি! কি মধু বিরহ দিয়া।

এই মিলন-বিরহের চক্র তখন ঘুরিতে থাকে। যখন ভক্ত ভগবানে ডুবিয়া যান তখন উভয়ে একাকার—তখন ভক্তও নাই ভগবানও নাই, সেটা মিলনাবস্থা; যখন ভাসিয়া উঠেন, তখন উভয়ের স্বরূপস্ফূর্তি হয় এবং উভয়ে কিঞ্চিৎ ব্যবধান, অভেদের মধ্যেও ভেদাভাস, থাকে, সেটা বিরহাবস্থা।

প্রাণারাম! প্রাণারাম! তোমা পাই কি না পাই,
আমি ভেসে উঠি, আমি ডুবে ডুবে যাই! (৩৬)

এ অনির্বচনীয় রহস্যের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভবপর নহে। জ্ঞানদৃষ্টিতে ঐ ডুবিয়া যাওয়াই ব্রহ্মসম্পত্তি বা প্রাপ্তি, ভাসিয়া উঠা বিচ্ছেদ; ভক্তিদৃষ্টিতে ডুবিয়া যাওয়াই বিরহ, কারণ তখন ভগবান হারাইয়া যান, আর ভাসিয়া থাকা মিলন। বস্তুতঃ উভয়ে কোন ভেদ নাই। দৃষ্টিভেদে ভেদ মনে হয় মাত্র। একই নিত্য অবস্থার একপিঠে মিলন অপর পিঠে বিরহ। যখন মিলন তখন বিরহ নাই, যখন বিরহ তখন মিলন নাই, কিন্তু সম্ভোগ কিংবা বিপ্রলম্ভ উভয়ই সমরূপে আনন্দের অবস্থা।

* * *

সাধারণতঃ মনে হইতে পারে এখানেই ত' সব পরিসমাপ্ত হইল, গ্রন্থেরও এখানে অবসান হওয়া উ'চত। কিন্তু ক'ব বলেন যে এখানেও শেষ নয়—এখনও তৃষ্ণা মিটে নাই। এই মিলন-বিরহ, যদিও ইহা নিত্য এবং অপ্রাকৃত, তবু ইহা এপারের বস্তু। ইহার মধ্যেও সাধক সেই আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটি পান নাই—তাঁহার রহস্যের সমাধান এখানেও হয় নাই। ভিখারী ভগবান্‌কে, কাঙ্গাল ঠাকুরকে তিনি এখনও দেখিতে পান নাই—যাঁহার জন্য তাহার প্রাণ কাঁদিতেছে তাঁহারও প্রাণ যে তাহারই জন্য সদাই কাঁদিতেছে—ইহা এখনও দেখিতে পান নাই। রাজবেশে রাজেশ্বর মূর্তি দেখিলেন, জগতের মধ্যে করুণার প্রবাহ দেখিলেন, অনন্তের আভাস ফুটিল, সংসারের মোহন মূর্তি ভাঙ্গিয়া গেল, বৈরাগ্যের ছায়া হৃদয়কে স্পর্শ করিল—ক্রমে সাধকমূর্তি, গুরুবেশ প্রত্যক্ষ করিয়া তৎপ্রদত্ত শক্তিসহায়ে জগৎকে বিলীন করিয়া সব মিটাইয়া মহাশূন্যে অবগাহন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশকালের সীমা অতিক্রম করিয়া যোগাবস্থায় যোগিরূপ দর্শন করিলেন, পরে জাগিয়া উঠিয়া ভিতরে বাহিরে লীলাপ্রকাশ অনুভব করিলেন ও ভক্তরূপে সাক্ষাৎকার করিলেন। এই ভক্তি অবস্থাতেই বিরহ-মিলন, দ্বৈতাদ্বৈত, পর্যায়ক্রমে উভয়ের স্বরূপ বোধ হইয়া গেল। এটা শৃঙ্গার রস বা 'আদি'রসের অনুভূতির অবস্থা। সাধারণতঃ ইহার পরে আর কেহ যান না, অথবা যাওয়া সম্ভবপর মনে করেন না। শৃঙ্গারই যে রসের আদি তাহাই সকলে জানে।

কিন্তু কবি আমাদের একটি নূতন কথা শুনাইয়াছেন। তিনি বলিতে চান যে করুণাই মূল জিনিস, শৃঙ্গার নহে। কথাটা একেবারে নূতন নহে, ভবভূতি দ্বাদশ শতাব্দী পূর্বে একবার এই কথা বলিয়াছিলেন—'একো রসঃ করুণ এব নিমিত্তভেদাৎ ভজতে বিবিধান্ বিবর্ত্তান্"। বর্তমান যুগে 'ত্রিবেণী-সঙ্গমে'ও কতকটা এই ভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—যুগলপ্রেমের সার্থকতা তৃতীয়ের মধ্যে, পরস্পরের মধ্যে নহে—যেমন স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরপ্রীতি শিশুর প্রতি স্নেহে সফলতা লাভ করে। এখানেও করুণার বাণী প্রচারিত হইয়াছে। সত্যই আজ যতক্ষণ ভগবানের কাঙ্গাল তৃষ্ণাকুল বেশ না দেখিতে পাওয়া যায়, ততক্ষণ সাধকের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা মিটে না। সাধক জানিতে চান—

ওপারে কি বসে কেহ তৃষ্ণার্ত্ত আকুল,
পরাণ পরশ তরে আমারি মতন ?
ওপারে কি দেখা যায়, অনন্ত অতুল
তোমার অন্তর ছায়া পরাণ স্বপন ?
আমি যে তৃষিত বড়, ওগো মহাপ্রাণ !—
আমি যে তৃষ্ণার্ত্ত অতি পরাণ মাঝারে !
আমারে ডুবায়ে দাও ওগো মহাপ্রাণ !
আমারে ভাসায়ে লও, তোমার ওপারে !
তবে কি মিলিবে মোর আশার স্বপন ?
কাঙ্গাল পরাণ হবে রাজার মতন ? (৩৮)

যে মহাপ্রাণ জীব ও ঈশ্বরের যোগভূমি আজ তাহারই প্রান্তদেশে আসিয়া সাধক উপনীত। ইহাই কবির ভাষায় 'ওপার' বা 'পরপার'।

* * *

ভাবের রাজ্য এই মহাভাবেই শেষ হইয়া গেল। এই মহাভাব যদিও অনন্ত বটে, তবু ইহাতে সান্তের সহিত সম্বন্ধ আছে—তাই সীমা একেবারে ছাড়ে নাই। এখান হইতেও কূল দেখিতে পাওয়া যায়। সাধক ভূমার মধ্যে—এপার-ওপার উভয়ই ত্যাগ করিয়া অপারের মধ্যে—মগ্ন হইতে

উদ্যত; আজ সর্বভাব চরমভাব বা মহাভাবের মধ্য দিয়া ভাবাতীতে প্রবেশোন্মুখ। কবি বলিতেছেন—

এপার ওপার করি, পারি না ত আর!
আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার!
পরাণ ভাসিয়া গেছে কূল নাহি পাই!—
তোমার অপার বিনা কোথা তার ঠাঁই! (৩৯)

আজ অপারের জন্য কবি-হৃদয় পাগল। যাহাকে এপারে খুঁজিয়া পাইলেন না, ওপারেও যাহার সন্ধান মিলিল না—আজ তাহারই আশায় অথবা সে আশাও বিসর্জন দিয়া তিনি অপারে ডুবিতে ব্যগ্র।

খুঁজেছি তোমারে কত তরঙ্গের মাঝে,
খুঁজেছি যেখানে তব গীতধ্বনি বাজে!
তোমার অপূর্ব ওই আলো অন্ধকারে,
প্রতিদিন প্রতিরাত্র খুঁজেছি তোমারে!

কিন্তু পাওয়া যায় নাই। ঐ তরঙ্গ, ঐ আলোময় গীতিময় ভাবরাজ্য আর ঐ সদা শান্ত, আলো-আঁধার মাখা, শব্দ ও শব্দাতীতের সন্ধিস্থল মহাভাব-রাজ্য, কোথাও ত রহস্যের সমাধান হইল না। তাই আজ কবির শেষ আকাঙ্ক্ষা সমস্ত পরিচ্ছেদ উল্লঙ্ঘন করিয়া সেই তুর্যাতীতের মধ্যে প্রবেশ করিবেন। যিনি জীবের চিরসখা অথচ নিত্যগুরু—যিনি সীমার মধ্যে থাকিয়াও সীমার অতীত, যিনি এক হইয়াও অনেক অথচ একানেক গণনার ঊর্দ্ধস্থ, যিনি বিশ্বাত্মক হইয়াও বিশ্বনায়ক অথচ স্বরূপতঃ বিশ্বোত্তীর্ণ, যিনি সর্ববৈষম্যের সাম্যভূমি অথচ স্বভাবতঃ তাহারও অতীত, এপার ওপার অপার সকলই যাঁহার স্বধাম অথচ যিনি ধামবর্জ্জিত, যাঁহাকে সৎ অসৎ সদসদুভয়াত্মক ও সদসদুভয়বিলক্ষণ সবই সমকালে বলা যায়, অথচ যিনি চতুষ্কোটি হইতে নিত্যবিনির্মুক্ত—তিনিই জীবের চরম প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন—

হে মোর আজন্ম সখা! কাণ্ডারী আমার!
আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার!

*　　*　　*

'সাগর-সঙ্গীত' খানা পাঠ করিয়া আমাদের মনে যে কয়েকটি কথার উদয় হইয়াছে যথাসম্ভব সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা হইল। ইহাকে যদি কেহ সাগর-সঙ্গীতের ব্যাখ্যা বলিয়া মনে করেন, আমাদের তাহাতে আপত্তি নাই। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে এরূপ ব্যাখ্যা অনেক হইতে পারে, কিন্তু কোন ব্যাখ্যাই মূল গ্রন্থের অনুকল্প নহে। কাব্য উপভোগের বস্তু, আস্বাদনের সামগ্রী, ব্যাখ্যা সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণমূলক বুদ্ধির ব্যাপার মাত্র। আমরা সাগরসঙ্গীতখানা যেরূপ বুঝিয়াছি তাহাই কিঞ্চিৎ বলিতে চেষ্টা করিয়াছি, ইহার আস্বাদন সহৃদয়গণ স্বয়ংই করিবেন। আস্বাদন না করিয়া, শুধু বুদ্ধির দ্বারা, প্রকৃত আনন্দ লাভ হয় না।

চিত্তরঞ্জনের কাব্য বঙ্গসাহিত্যে একটি নূতন সুর লইয়া উদিত হইয়াছে। যাঁহার কানে সে সুর বাজিয়াছে তিনি অবশ্যই তাহাতে মুগ্ধ না হইয়া পারিবেন না। ইহা বীণার নিক্বণ নহে, বংশীর ধ্বনি নহে—ইহাতে শিল্পকৌশল কিছু মাত্র নাই। যাঁহারা ভাষার চমক, ভাবের উল্লাস, রচনার পরিপাটী, ছন্দের নৃত্য কিংবা অলঙ্কারের ঘটা দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়া 'সাগরসঙ্গীত'খানা খুলিবেন তাঁহারা নিরাশ হইবেন। যাহাতে চিত্তকে বিস্মিত, বিহ্বল করিয়া তোলে ইহাতে তাহার কিছুই নাই। অথচ ইহাতে যাহা আছে অন্যত্র তাহা সর্বদা চোখে পড়ে না। চিত্তরঞ্জনের কাব্যের প্রধান গুণ স্বচ্ছতা এবং আন্তরিকতা। এই সরল, সুন্দর আবেগময় আন্তরিকতাই পাঠক-হৃদয়ের তলদেশ পর্যন্ত যাইয়া স্পর্শ করে, দেখিতে দেখিতে কবি ও পাঠকের মধ্যে একটা সহৃদয়তা-পূর্ণ একাত্মভাবের প্রতিষ্ঠা হয় ও অপরিচয়ের আবরণ অপসারিত হইয়া যায়।

সুকণ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ সাধক যখন একতারায় ঝঙ্কার দিয়া একান্তমনে আপন প্রাণের ব্যথা প্রাণেশ্বরের পদপ্রান্তে নিবেদন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন সেই সরলহৃদয়ের সহজ সুর যেমন চিত্তাকর্ষক মনে হয়, অতি সূক্ষ্ম কৌশল ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধ্রুপদ আলাপনেও তেমন হয় না। সম্রাট আকবর তানসেনের লোকোত্তর সঙ্গীতনৈপুণ্যে কখনই তত মুগ্ধ হন নাই, যত তাহার সরল

হৃদয়োচ্ছ্বাসপূর্ণ বাক্য শুনিয়া একদিন হইয়াছিলেন। প্রতিদিন নির্জন যমুনাতটে নবোদিত সূর্যমণ্ডলের দিকে লক্ষ্য করিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে গদ্‌গদ-কণ্ঠে যে সহজ সরল প্রার্থনাসঙ্গীত তানসেন গাহিতেন, মোগল-সম্রাট সে মধুর স্বরলহরী আপন সভাতে একদিনও শুনিতে পান নাই। ভগবানের কাছে ভক্তের আত্মনিবেদন সত্যই এমনি মধুর।

আমরা আর বিশেষ কিছু আলোচনা করিব না। সাধক-কবি চিত্তরঞ্জন আজ তপস্যার প্রভাবে নির্ধূতকল্মষ—আজ তিনি আরও বড সাধক এবং আরও বড় কবি। তাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা তিনি নববলে বলীয়ান্ হইয়া উত্তরোত্তর 'সাগরের' মহিমা গাহিতে থাকুন। তিনি চিরজীবী হউন, তাঁহার কণ্ঠ চিরজীবী হউক। তাঁহার কাছে ভাগ্যহত বঙ্গভূমির অনেক আব্‌দার আছে,—আর দীনা বঙ্গবাণীরই কি নাই? আশা করি বঙ্গসাহিত্য তাঁহার কৃপা-কটাক্ষে বঞ্চিত হইবে না।

ত্রিবেণী-সঙ্গম

আমরা উপরে আলোচনার জন্য যে গ্রন্থখানির নাম উল্লেখ করিয়াছি সেখানি বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে একটি অত্যুজ্জ্বল রত্নস্বরূপ। বঙ্গভাষা আজ সমৃদ্ধিশালিনী এবং বহু বিষয়ে শ্রীসম্পন্না হইলেও এরূপ রত্নকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। ভাষার লালিত্য, রচনার ভঙ্গী, ভাবের গাম্ভীর্য এবং উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব সর্ব্বতোমুখ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে একাধারে সমবেত হইয়া এই অপূর্ব গ্রন্থরত্নের সৃষ্টি করিয়াছে ইহাতে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের এবং প্রাচীন-নবীনের সমন্বয় করিবার চেষ্টা আছে—তাই ইহা সকলের উপভোগ্য। বর্তমান যুগ-সন্ধি ও দেশগত বিভিন্ন আদর্শের সংঘর্ষকালে এরূপ গ্রন্থের উপযোগিতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হয়। তবে এই সমন্বয়-চেষ্টা কতটা সফলতা লাভ করিয়াছে তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। আমরা ভারতীয় সাধনার মানদণ্ড অবলম্বনপূর্ব্বক, যতটা সম্ভব ব্যক্তিগত সংস্কার পরিহার করিয়া, নিজের জ্ঞান ও শক্তি অনুসারে এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

আলোচনার দিক্ অনেক। আমরা উদ্দেশ্য অথবা লক্ষ্যের দিক্‌টাই প্রধানতঃ গ্রহণ করিলাম। যদি অবসর হয় ত সময়ান্তরে সাহিত্য ও রসস্ফূর্ত্তির দিক্‌টাও গ্রহণ করিব।

সে দিকেও এ গ্রন্থের স্থান অতি উচ্চে। রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থকর্ত্রীর প্রথম রচনা ‘বসন্তপ্রয়াণের’ মুখবন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন ‘ত্রিবেণী-সঙ্গম’ সম্বন্ধে সে কথা আরও অধিকতর প্রযোজ্য। আমাদের মনে হয় কেবল বাঙ্গালা সাহিত্যে নহে, জগতের যে কোন সাহিত্যে এরূপ গ্রন্থ বিশেষ আদরের সহিত গৃহীত হইবে।

বঙ্গভাষায় কমলাকান্ত যে সুর সর্বপ্রথম শুনাইয়াছিলেন, যাহার একটু প্রতিধ্বনি ধরিয়া উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেমিক ‘চন্দ্রশেখর’ বাঙ্গালী সমাজকে মাতাইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, আজ (‘বসন্তপ্রয়াণ’ ও) ‘ত্রিবেণী-সঙ্গমের’ মধ্যেও যেন স্থানে স্থানে সেই পুরাতন সুর বাজিয়া উঠিতেছে শুনিতে পাই—ঠিক যেন সে সুর নয়, তবুও যেন তাহাই। পূরবী অথবা বেহাগ তাহা বুঝি না

—যেন করুণা এবং বিষাদ একসঙ্গে সম্মিলিত হইয়া এক অপূর্ব রাগিণী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে।

'ত্রিবেণী-সঙ্গম' নামটি শুনিলেই প্রাণে একটা পুণ্যস্মৃতি জাগিয়া উঠে। সঙ্গম মাত্রই পবিত্র, বিশেষতঃ ত্রিধারার সঙ্গম যেখানে, তার মত পবিত্র তীর্থ জগতে আর কোথাও নাই। তাই গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গমক্ষেত্র প্রয়াগভূমি তীর্থরাজ বলিয়া পরিগণিত; তাই দেহমধ্যেও ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নারূপ প্রবাহত্রয়ের মিলন-স্থল অতি পবিত্র। এ ত্রিবেণী যুক্ত হউক, অথবা মুক্ত হউক—ক্ষতি নাই, অবগাহনে ফল আছে। আমরা এই ভাবিয়া এ অভিনব-ত্রিবেণীর তীর্থসলিলে অবগাহন করিতে নামিলাম—দেখি কোন ফল লাভ করিতে পারি কি না।

* * * *

আলোচনার প্রথমেই একটা কথা স্পষ্টরূপে বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক মনে করি। গ্রন্থখানি যদিও ত্রিবেণী-সঙ্গম নামে অভিহিত, তথাপি সাধারণতঃ আমরা সঙ্গম বলিলে যেরূপ বুঝি, ইহা সেরূপ সঙ্গম নহে। ইহাও সঙ্গম বটে, কিন্তু একটু ভিন্নরকমের। বিভিন্ন দিক্ হইতে সমাগত কয়েকটি বিভিন্ন (স্বতন্ত্র) ধারা একত্র সম্মিলিত হইয়া এক অভিন্ন ধারায় পরিণত হইলেই তাহাকে সাধারণতঃ সঙ্গম বলা হয়। কিন্তু এখানে 'সঙ্গম' মানে বিরোধ-সমন্বয়। অভাবের মধ্য দিয়া ভাব মহাভাবে সমন্বয় প্রাপ্ত হয়, বিরহের মধ্য দিয়া কত মিলন পূর্ণ মিলনে পরিণত হয়। দুঃখের মধ্য দিয়া সুখ পরমানন্দে সামঞ্জস্যে লাভ করে। এইরূপ সমন্বয় অথবা সামঞ্জস্যের নামই সঙ্গম; ইহা ভাব ও অভাব উভয়াত্মক হইলেও উভয়ের অতীত।

গ্রন্থকর্ত্রী সরযূবালা বিশ্বপথের পথিক হইয়া যাত্রা করিয়াছেন, করিয়া ক্রমশঃ তিনটি অবস্থার অনুভব করিয়াছেন। প্রথমটি 'প্রস্থানে' (thesis); দ্বিতীয়টি 'মধ্যপথে' (anttihesis); তৃতীয়টি সঙ্গমে' (synthesis)। 'রঙ্গ' এবং 'ধোঁয়া' প্রথম অবস্থারই দুইটি বিভিন্ন বিকাশ মাত্র,—'ধোঁয়া' প্রথম অবস্থার অন্তে হইলেও দ্বিতীয় অবস্থার পূর্বাভাস। দ্বিতীয়টি মাঝের অবস্থা,—ইহারও আবার দুইটি দিক্ আছে,—একটি অভাবাত্মক (negative)—ফাঁকা, আর একটি ভাবাত্মক (positive)—'মাঝে থাকা'। এই যে ভাব, ইহাও বস্তুতঃ অভাবেরই একটা প্রকাশ মাত্র, তাই প্রসন্নতার অন্তরে অন্তরে এই অবস্থার

একটা মর্মান্তিক বেদনা জাগিয়া থাকে। সাধনা জীবনে resignation-এর যে স্থান, এ তীর্থযাত্রায় 'মাঝে থাকা'র কতকটা সেই স্থান। এ 'মাঝে থাকা' অবস্থা দ্বিতীয় হইলেও, এখান হইতেই তৃতীয় অবস্থার আভাস পাওয়া যায় —'সঙ্গমের' পবিত্র দৃশ্য এখান হইতেই দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। তারপর 'সঙ্গম,' যেখানে সর্ববিরোধ সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে।

* * * *

প্রাকৃতিক জগতে বিজ্ঞানের ভাষায় evolution বলিলে যাহা বুঝায়, সরযূবালা তাহাকেই 'যাত্রা' বলিয়াছেন। Evolution-এর শেষ যেখানে, যে পূর্ণতা (?) প্রাপ্তিতে, এ যাত্রার অবসানও সেইখানে, সেই তীর্থ-সঙ্গমে *। যতদিন সে সঙ্গম প্রাপ্তি না হয় ততদিন এ চলার বিরাম নাই। অন্তরে, বাহিরে, স্থূলতম বিরাট্ দেহ হইতে সূক্ষ্মতম পরমাণু পর্যন্ত সর্বত্রই এই স্পন্দন, এই অশান্তি, এই চলিষ্ণুতা।

জগতের সকল জিনিসই গতিশীল। এই গতি চক্রাকার (cyclic). তাই প্রকৃতির মধ্যে কালচক্রের সীমান্তর্ভূত যে কোন পদার্থের দিকে লক্ষ্য করি, সেখানেই একটা প্রত্যাবর্তনের ভাব দেখিতে পাই। উত্থানের পর পতন, পতনের পর আবার পুনরুত্থান তাই স্বাভাবিক। যাহা আসে তাহা চলিয়া যায় বটে, কিন্তু ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার আসে। কিছুই চিরদিনের জন্য যায় না, কিছুই চিরদিনের জন্য আসেও না। যাওয়ার পর আসা, আসার পর যাওয়া—চক্রভ্রমিক্রমে অনবরত চলিতেছে। গতিই এখানকার ধর্ম—আর এই গতি চক্রাকার, আবর্তময়—সরলরৈখিক (rectilinear) নহে। যদি সরলরৈখিক হইত তবে যাহা যাইত তাহা আর ফিরিত না।

এইটি হইল জড়-জগতের ধারা। অনন্ত আবর্ত, অনন্ত ঊর্মিমালা অঙ্গরূপে বক্ষে ধারণ করিয়া, কত কত সৃষ্টি-প্রলয়, আলো-অন্ধকারের মধ্য দিয়া এ ধারা অনাদিকাল হইতে এক অনন্তসমুদ্রের উদ্দেশ্যে তীরবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাই বসন্তের পর শীতান্তে আবার বসন্ত আসে, নিদ্রাবসানে আবার জাগরণ দেখা দেয়—যতদূর দৃষ্টি যায় এ ধারার বিচ্ছেদ দেখিতে পাওয়া যায় না।

* কিন্তু সরযূবালা এ কথাটা ঠিক মানেন না (দ্রষ্টব্য :—ত্রিঃ সঃ পৃঃ ৩৯ পঃ ৫)। তিনি উন্নতিকে অনন্ত বলিয়া স্বীকার করেন। তাই এ 'অবসান' তাঁহার মতে আপেক্ষিক—কেন না, ইহার পরে আবার নূতন গতি আছে।

মনে হয় যেন একটি অসীম সূত্রমধ্যে 'মণিগণের ন্যায়' এই জগতের আবর্তনশীল অবস্থাপর্যায় গ্রথিত রহিয়াছে।

সেইরূপ একটি প্রাণের ধারাও আছে—সেটিও অসীম, বিশ্বময়, সর্বব্যাপক। দেশ, কাল কিংবা আধার-ভেদে তাহার পরিচ্ছেদ নাই। ব্যষ্টি-চৈতন্য জীব সেই বিশ্বপ্রাণেরই একটি অংশমাত্র, সেই দাবানলের এক কণা স্ফুলিঙ্গ।

অসীম জড়া প্রকৃতি এবং অনন্ত চিন্ময়ী প্রকৃতি একই আনন্দময়ী মহাশক্তির বিলাসরূপে সর্বত্র এবং সর্বদাই ওতপ্রোতভাবে বর্তমান রহিয়াছেন, ঐশ্বর্য এবং মাধুর্যের অভাব ত' কোথাও নাই।

তবে জীব কাঁদে কেন?

* * * *

জীব কাঁদে, কেন না জীব জাগিয়াছে, জাগিয়া নিজের অভাব বুঝিতে পারিয়াছে। অভাববোধ ফুটিয়াছে, অথচ অভাব-নিবৃত্তির উপায় খুঁজিয়া পাইতেছে না, তাই সে কাঁদে।

যেদিন জীব নিজের প্রিয়জন লইয়া বড আশায় এই স্বভাবের খেলাঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, সেদিন মায়ামোহের আবেশে, তন্দ্রার ঘোরে, এ সংসার তাহার নিকট স্বপ্নপটের ন্যায় অতি মধুরই বোধ হইয়াছিল। স্বভাবের অতুলনীয় শোভা সত্যই সেদিন তাহাকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল।

কিন্তু সে আনন্দ আজ কোথায় মিলাইয়া গেল! স্বভাব ত' আজও তেমনই সুন্দর আছে, শত পরিবর্তন সত্ত্বেও জগৎ এখনও ত' পূর্বের ন্যায় অপার মাধুরীর ভাণ্ডারস্বরূপই রহিয়াছে। এখনও সেই বসন্ত আসে, সেই কুসুম ফোটে, সেই মলয় বহে, সেই নক্ষত্র জ্বলে, "চন্দ্রমাশালিনী সা মধুযামিনী" এখনও দেখা দিয়া যায়—শৈশবের হাসি, যৌবনের উল্লাস এখনও জগৎ হইতে বিদায় লয় নাই। এ সবই ত' সুন্দর—অতি সুন্দর। তবে আজ আর প্রাণ তাহাতে রস পায় না কেন? হৃদয়ের আনন্দ কিজন্য শুকাইয়া গেল?

শুকাইয়া গেল, তাহার কারণ আছে। "নিশার স্বপন-সুখে সুখী যেই, জাগে সে কাঁদিতে।" জীব এতদিন যে-সুখে আত্মবিস্মৃত হইয়া প্রকৃতির নন্দনসুষমা উপভোগ করিয়াছিল, সেটা অস্থায়ী মায়িক সুখ, স্বপ্নের খেলা মাত্র। জাগরণের সঙ্গে তাই তাহা কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, সে খেলাঘর অদৃষ্টচক্রে কোথায় নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছে।

মানুষ ভালবাসিতে চায়, কিন্তু ঠিক ভালবাসিতে পারে না, জানেও না। তাই তাহার ভাগ্যে দুঃখ ভিন্ন আনন্দ কোথাও জোটে না। এই ভালবাসা যে কি বস্তু তাহা মায়ার রাজ্যে থাকিয়া যথার্থভাবে অনুভব করা যায় না। সেইজন্য মায়ান্ধ মনুষ্য ইহার পূর্ণরূপ দর্শন করিতে পারে না। যেদিন পারিবে সেদিন মায়ার অবগুণ্ঠন তাহার নয়ন হইতে ঘুচিয়া যাইবে। সে যোগমায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পরমামৃতের মধুর আস্বাদ প্রাপ্ত হইবে।

ভালবাসাই আত্মজ্ঞান, আত্মদর্পণ। দর্পণ না হইলে যেমন নিজের রূপ নিজে দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ আধার না পাইলে ভালবাসাও চরিতার্থ হয় না। মানুষ নিজেকেই নিজে ভালবাসে বটে, কিন্তু যতক্ষণ নিজের স্বরূপ আর একজন মানুষের স্বচ্ছ হৃদয়-দর্পণে প্রতিবিম্বিত না দেখিতে পায় ততক্ষণ নিজেকে চিনিতেও পারে না, ভালবাসিতেও পারে না। তাই দর্পণ চাই, "দুই" না হইলে ভালবাসার সম্ভাবনা কোথায়? 'পর' ব্যতীত আত্মপ্রেম নিষ্ফল।

প্রকৃতিও দর্পণ বটে, কিন্তু এ দর্পণে মানুষ নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দেখিতে পায় না। চিন্ময় না হইলে চিন্ময়কে ধারণ করিবে কে? তাই—"মানুষের মন চাহে মানুষেরি মন"। *

মায়া-রাজ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে কাহারও এরূপ মনের মিলন ঘটিয়া যায়; তখন উভয় মনে সমসূত্র-পাত হইয়া আত্মবিস্মৃতি ঘটে, "প্রাণময়ে প্রাণ লীন" (পৃঃ ১০) হইয়া যায়। একটা নেশায় মন প্রাণ তখন বিভোর থাকে, নীল আকাশ, শ্যামলা ধরণী, প্রকৃতির সকল বস্তুই তখন জীবের ভাবনেত্রের সম্মুখে অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়া উঠে।

কিন্তু এ ভাব দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না, এ নেশাও দুদিনেই ছুটিয়া যায়। যাহাকে অবলম্বন করিয়া এ রসের উদ্ভব হয়, যখন কালনেমির অবশ্যম্ভাবী আবর্তনে তাহা নয়নের অন্তরাল হইয়া যায়—তখন হৃদয় নীরস এবং যন্ত্রণায় প্রপীড়িত হইয়া উঠে। জীবের 'সাজান বাগান' এইভাবেই শুকাইয়া যায়। অতীতের বেদনাময়ী স্মৃতি বক্ষে পোষণ করিয়া জীব নৈরাশ্যের অতল সমুদ্রে ডুবিয়া যাইতে চায়।

* রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা—"ভগ্নহৃদয়"।

তখন বাহ্য প্রকৃতির ব্যঙ্গ তাহার হৃদয়কে আঘাত করে। বাহিরে বসন্ত যায় আবার আসে, ফুল ঝরে আবার ফোটে, আঁধারের পরে আবার আলো হাসে—কিন্তু অন্তরের ধন একবার চলিয়া গেলে আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না। জীব দেখে অন্তরে বাহিরে এই বৈষম্য, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের এই অসামঞ্জস্য, —কিন্তু বুঝিতে পারে না কিসে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

জগতের সৌন্দর্য নিষ্ফল যদি প্রিয়জন না থাকে, যাহার সান্নিধ্য ও অঙ্গ-কান্তিতে সেই সৌন্দর্য শতগুণ বর্ধিত হইয়া নয়ন-মনের তৃপ্তি সাধন করিতে পারে। শুধু নিষ্ফল নয়, সে সৌন্দর্য নিদারুণ যন্ত্রণার কারণ। প্রকৃতি আজও তেমনই সুন্দরী, হৃদয়ে সৌন্দর্যানুরাগ এখনও তেমনই প্রবল, অথচ সে সৌন্দর্য উপভোগ করিবার সে সহচর নাই!

সম্মুখে অনন্ত জীবন, হৃদয়ে অনন্ত আকাঙ্ক্ষা, জীবও নিত্য ভোক্তা—কিন্তু ভোগ্য পদার্থ ত' অনন্ত নহে। কণ্ঠের পিপাসা কণ্ঠেই থাকে, অথচ পানীয় ফুরাইয়া যায়। একবিন্দু জলপানে কি অনন্ত পিপাসার উপশম সম্ভবপর?

তাই জীব কাঁদে—সেই অজানা অনন্ত বারিরাশির দিকে লক্ষ্য করিয়া জীব কাঁদে। নিজের স্থায়ী প্রতিরূপ দর্শন করিবার জন্য জীব কাঁদে। কিন্তু দর্পণ যে মিলে না। জগতে সবই আছে, কিন্তু প্রাণের নিত্যদর্পণ কোথায়? স্বরূপদর্শন কি উপায়ে ঘটিবে? অন্তরে বাহিরে নবীনতা ভরা। এ নবীনতায় হৃদয় আরও উদাস হইয়া উঠে। বিশ্বসৌন্দর্য তেমনই থাকে,—

> "চিরদিন এ আকাশ নবীন নীলিমাময়,
> চিরদিন এ ধরণী যৌবনে ফুটিয়া রয়"—

হৃদয়ের আশা তৃষ্ণাও তেমনই থাকে। বৈরাগ্য জন্মে না, অনুরাগও কমে না অথচ অনুরাগের বস্তু কালস্রোতে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যায়। বাহির ও অন্তরের এ অসামঞ্জস্য হইতেই জীবনের প্রথম বেদনা ফুটিয়া উঠে। তাই জীব কাঁদে।

এ অসামঞ্জস্য বা বিরোধ বড় ব্যাপক। দুঃখমাত্রই এই বিরোধ হইতে জন্মে: ভাবের সঙ্গে ভাষার বিরোধ, আশার সঙ্গে সফলতার বিরোধ, চাওয়ার সঙ্গে পাওয়ার বিরোধ, অদৃষ্টের সঙ্গে ইচ্ছা ও পুরুষকারের বিরোধ, আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের বিরোধ, মানবের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সমাজের স্থিতির বিরোধ—

ইত্যাদি সকলপ্রকার বিরোধই একজাতীয়। Tragedy এবং romance এর মূলেও এই বিরোধই দেখিতে পাই। ইহার সমন্বয় ভিন্ন শান্তি নাই।

এই সমন্বয়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া জীব কাঁদিতে থাকে। মোহাবসানে নব জাগরণের মুহূর্তে জীবের হৃদয়ে এই অনন্ত ব্যাকুলতা স্থান লাভ করে। এই ব্যাকুলতার প্রেরণাতেই সে মহাযাত্রার যাত্রী হয়, যাহার অবসানে তাহার সকল অতৃপ্তির বিরামস্থল সেই অনন্ত তীর্থ-সঙ্গমের প্রাপ্তি ঘটে।

[২]

প্রকৃতি-মাতার 'গোপন' অন্তঃপুর হইতে যেদিন জীব সর্বপ্রথম এই আলোকময় বহির্জগতে প্রবেশ লাভ করিল, সেইদিন হইতেই তাহার গতিশীল জীবনের প্রারম্ভ, সেইদিন হইতেই সে যত অস্ফুটভাবেই হউক, 'আমি আছি' ('অস্মিতা,' 'self-consciousness') বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছে, সেইদিনই এ মায়িক-জগতে তাহার প্রথম জাগরণ।

কিন্তু এই জাগরণের পূর্বে জীব যে অবস্থায় থাকে সে একটা মোহ কিংবা অজ্ঞানের অবস্থা—দেশ-কালের বোধ অথবা সত্তা জীবের পক্ষে তখন থাকে না। আবর্তনশীল কাল-চক্রের পরিধির বাহিরে, মূলা প্রকৃতির গভীর অন্ধকারময় গহ্বরে, জীব তখন মহানিদ্রায় নিদ্রিত থাকে। শুধু জীব কেন, জীবের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জগৎও সেই দিগন্তবিস্তৃত শূন্যসাগরে একাকার হইয়া থাকে। সে অনন্ত অতল মহাসমুদ্রে বায়ু প্রবাহিত হয় না, আলোক-রশ্মিও প্রবেশ-পথ পায় না, কোনপ্রকার বৈচিত্র্যের বিলাস সে একার্ণবে স্থান লাভ করে না। এই স্পন্দনহীন, ক্রিয়াহীন, চেতনাহীন জড় অবস্থায় জীব তখন ঘুমাইয়া থাকে। এটা কালাতীত অবস্থা, সেই জন্য গ্রন্থকর্ত্রী এ নিদ্রার নাম "অ-কালনিদ্রা" (পৃঃ-৪০, পং ১৩, ১৪) রাখিয়াছেন।

কিন্তু এ নিদ্রা চিরদিন থাকে না। 'নিয়তি'র প্রেরণায় এ নিদ্রার অবসান হয়, জীব জাগিয়া উঠে, উঠিয়াই চলিতে আরম্ভ করে। কালাতীত অবস্থা হইতে কালের মধ্যে প্রবেশ করিলেই 'পরিণাম-ক্রম'—গতিশীলতার আরম্ভ হয়। তখনই জীবের আত্মচৈতন্য বিকাশ লাভ করে। প্রথম প্রথম এই চৈতন্য ক্ষুদ্র এবং খণ্ড জ্যোতিঃকণার ন্যায় অত্যন্ত পরিচ্ছিন্নই থাকে, কিন্তু

ক্রমশঃ ইহা বিশ্বময় ব্যাপ্ত হইয়া সকলপ্রকার বিরোধের সমন্বয়পূর্বক পূর্ণানন্দের মধ্যে, অখণ্ড সামঞ্জস্যের মধ্যে স্বসত্তার সফলতা সম্পাদন করে। এই ক্রম-বিকাশ অথবা ক্রমব্যাপ্তির ইতিহাসই সঙ্গম-প্রাপ্তির ইতিহাস।

জীব চৈতন্যময় সত্য কিন্তু যতক্ষণ সে নিজে 'আছি' বলিয়া অনুভব না করে, ততক্ষণ সে থাকিয়াও না থাকার সমান, কারণ প্রকাশমান সত্তাই প্রকৃত সত্তা এবং আত্মপ্রকাশই যথার্থ প্রকাশ। এই প্রকাশের পূর্ণতা অথবা অবাধিত অবস্থাই আনন্দ, ইহাই সত্য জাগরণ। জীব যখন অজ্ঞানভূমি হইতে বাহির হইয়া বিশ্বমণ্ডলে আপনার স্থান অধিকার করিতে করিতে চলিতে থাকে, তখন হইতেই তাহার স্বসত্তাবোধ উদ্বুদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইতে থাকে। এই বোধের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দেরও নিবিড়তা এবং পূর্ণতা সিদ্ধ হয়। জীবের প্রথম জাগরণ মায়ার জগতে, অন্তিম জাগরণ যোগমায়ার রাজ্যে—এই উভয় জাগরণের অন্তরালবর্তী মার্গানুসরণই সঙ্গম প্রাপ্তির ইতিহাস।

জীব যখন নিয়তিবশে মোহময় জড়রাজ্যের প্রান্তরেখা লঙ্ঘন করিয়া জাগিয়া উঠে, তখন তাহার আত্ম-চৈতন্যের সম্মুখে সর্বাগ্রে পূর্বাপর এবং পরস্পর বিভিন্ন বৃত্তির ধারাবোধরূপ কাল-জ্ঞান ফুটিয়া উঠে। এই যে মূলা প্রকৃতি যাহার অপর নাম মহাসুষুপ্তি, যাহার ক্রোড়ে কোটি কোটি জীব-পুঞ্জ নিরালোক খদ্যোত-পুঞ্জের ন্যায় ঘুমাইয়া থাকে, ইহাই 'শূন্য জড়রাজ্য' (পৃঃ ৪১, পং ৪)। জড় এইজন্য যে ইহা স্থির, চাঞ্চল্যহীন। যতক্ষণ ইহাতে চিৎশক্তির অনু-প্রবেশ অথবা সঞ্চার না হয় ততক্ষণ ইহাতে ক্রিয়াশীলতা জাগে না। এই শক্তিসঞ্চার অথবা শক্ত্যুন্মেষজন্য উদ্বেলতাই প্রকৃতির বিক্ষোভ এবং বিক্ষুব্ধা প্রকৃতিই 'কারণ-সাগর'। সাম্যাবস্থাপন্না প্রকৃতিকে জীব এবং জগতের কারণরূপে বর্ণনা করা চলে না—বৈষম্যাবস্থাই সৃষ্টির নিদান। প্রকৃতির এই সাম্যচ্যুতি হইতেই 'আমি-আছি' ভাব জাগে, সেইজন্য সরযূবালা বলিয়াছেন—"সেই কারণ-সাগর হইতেই 'আমি'র উদয় হইল" (পৃঃ ৪১, পং ৭)। উৎপত্তি অথবা অভিব্যক্তির অব্যবহিত পরক্ষণ হইতেই জীব এবং তাহার জগৎ কালের স্রোতে অবিরাম গতিতে ভাসিয়া চলে।

চলিতে চলিতে জীব একদিন চির-বসন্তের রাজ্যে আসে। তাহার নবীন হৃদয় সেদিন অনুরাগে রঞ্জিত, চক্ষু তন্দ্রালস, প্রাণ প্রিয়-সম্মিলন-সুখে বিভোর, —সেই আনন্দের উচ্ছ্বাসে আত্ম-বিস্মৃত অবস্থায় সেদিন বিশ্বমণ্ডলের সর্বত্রই

এক অভিনব সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠে। দেখিতে দেখিতে জীবের গতি রোধ হয়, কালের অবিশ্রান্ত তাণ্ডব যেন একটা 'অনন্ত-মুহূর্তে' ঠেকিয়া হঠাৎ থামিয়া যায়—মনে হয় যেন কূটস্থের দ্বারে আসিয়া পরিণামের বিপুলধারা একেবারে পরিসমাপ্ত হয়। জীব যে শক্তি এবং প্রাণ পাথেয়রূপে মূলাধার—পরমা প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে সঞ্চয় করে এখানে তাহা সব নিঃশেষ হইয়া যায়। তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহার জগৎও স্তম্ভিত হয়। একটা শূন্যময় অবকাশের মধ্যে জীব ও জগৎ তখন থমকিয়া দাঁড়ায়। জীবের গতিশীল জীবনে এই সর্বপ্রথম বিরাম।

এই বিরামের প্রয়োজন আছে। এই বিরাম না হইলে জীবনের গতি নূতন করিয়া পাওয়া যায় না। দিবা ও রাত্রির মধ্যে যেমন সন্ধ্যা, রেচক ও পূরকের মধ্যে যেমন কুম্ভক, এক ব্রহ্মাণ্ড এবং অপর ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যেমন শূন্যময় অবকাশ, সেইরূপ জীবনের গতিদ্বয়ের মধ্যেও বিরাম। এই বিরাম অথবা কারণ-সাগরে অবগাহন না করিলে জীব শক্তি অর্জন করিবে কোথা হইতে? জগতের যে কোন দ্বৈতের অন্তরালে এইরূপ একটা অব্যক্ত অবস্থা আছে—এই অব্যক্ত, সর্ব কার্যের কারণস্বরূপ মূলা প্রকৃতির মধ্য দিয়া অতিক্রম না করিলে এক ভাব ভাবান্তরে পরিণত হইতে পারে না। মনে হয় যেন সেইজন্যই জীব তাহার জগৎকে সঙ্গে লইয়া নব জাগরণের প্রতীক্ষায় প্রকৃতির বক্ষে ঘুমাইয়া পড়ে। দেশ-কালের রাজ্যে অভিব্যক্তি লাভ করিবার পূর্বে কার্য যেমন কারণের অন্তস্তলে, মাতৃ-অঙ্কে নিদ্রিত শিশুর ন্যায় লুক্কায়িত থাকে, এও ঠিক সেইরূপ। বীজাভ্যন্তরে বৃক্ষ যেমন, কোরকের মধ্যে কুসুম যেমন, সঙ্গীতজ্ঞের কণ্ঠে অনুচ্চারিত সঙ্গীত যেমন, আছে অথচ নাই, এও ঠিক সেইরূপ। শক্তির বীজ গর্ভে ধারণ করিয়া জীব তখন 'অব্যপদেশ্য' অবস্থায় ডুবিয়া থাকে।

পরে কে জানে কিসের অলঙ্ঘনীয় শাসনে এই 'নিরোধ' অবস্থা হইতে জীব আবার 'ব্যুত্থিত' হয়—আবার জাগিয়া উঠে। নূতন শক্তিতে, নবীন প্রাণে জীব আবার যাত্রা করে। এই যাত্রাই 'বসন্ত প্রয়াণ'। শূন্যগর্ভ হইতে, আমিত্ব-বোধ নূতন করিয়া ফুটিতেই জীব আপন আদর্শের অনুসরণ করিয়া লোক-লোকান্তর ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। তাহার জগৎও ঐ দিকেই ছুটে। কিন্তু দীর্ঘ দিনের অনুধাবনেও আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায়

না। জীব যতই অগ্রসর হয় ততই সে দেখিতে পায়, তাহার আদর্শ দূর হইতে আরও সুদূরে চলিয়া যাইতেছে। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞানও বাড়িতে থাকে, তাই ক্রমবৃদ্ধিশীল জ্ঞান পাইয়া জীব তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না, তাহার আদর্শ ক্রমেই সুদূর রহস্যের আকার ধারণ করিতে থাকে।

জীবের গতির বিরাম নাই। সে নূতন নূতন জগৎ দেখে, তাহার জ্ঞানের সীমাও বাড়িয়া চলে। কিন্তু যদিও তাহার দৃষ্টির প্রসার-ক্ষেত্র ক্রমেই বিস্তৃত হয় তথাপি সে পূর্বে যাহা দেখিতে পায় উপরে উঠিয়া আর তাহা পায় না। এইরূপে জীব ধীরে ধীরে নিম্নভূমি, তাহার চির-পরিচিত সুখময় ধরাধাম ত্যাগ করিয়া, ক্রমশঃ অধিকতর ব্যাপক মণ্ডলের মধ্য দিয়া, আপনার গন্তব্য আদর্শ-পানে ধাবমান হয়। ক্রমশঃ তাহার জগতের বর্ণ-বৈচিত্র্য কমিয়া আসে, দৃশ্যপট সর্ববর্ণের সম্মিশ্রণে শুভ্র শূন্যরূপ ধারণ করে।

তখন আর সে রঙের খেলা থাকে না, সেই লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণের বিচিত্র-চ্ছটা, সেই আত্মচৈতন্যের বিবিধ অনুপম ভঙ্গিমা, ছন্দোভেদে উত্থান-পতন,—তখন যেন সে সব স্বপ্নকুহেলিকা তীব্র সূর্যকরসম্পাতে মেঘমালার ন্যায় কোথায় আসিয়া মিলাইয়া যাইতে থাকে। আঁধারের পরে গভীরতর আঁধারে, গাঢ়তর রহস্যজালে জীবের চৈতন্য আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, জীব তাহার চির সাধের 'আমিত্ব' বিসর্জন দিতে উদ্যত হয়। তখন সে বুঝিতে পারে—অনন্ত আকাশের মধ্যে যে পথ অবলম্বন করিয়া তারকামণ্ডলের পর তারকামণ্ডল, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের পর বৃহত্তর ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিতে করিতে সে এতদিন চলিতেছিল, সেই "ব্যোম-মার্গ" (পৃঃ ১০, পং ১৬; ৪৬, ১০) অথবা "বিশ্বাতীতের পথে" (পৃঃ ৫০, পং ১৫) অনন্তকাল চলিলেও তাহার প্রাণের আদর্শ মিলিবে না; সে 'নিত্যধাম' কিংবা 'পরব্যোম' চিরদিন তাহার সকল শক্তির অতীত হইয়াই থাকিবে—অনন্ত কখনই সান্ত হইবে না। জীব বুঝে 'তুরীয়' অথবা 'ভূমা'কে এইভাবে খুঁজিয়া বাহির করা যায় না। তাই সে আরও আলো ("More Light"—Goethe), আরও আনন্দের সন্ধানে বাহির হইয়া শেষকালে ঘোর অন্ধকারময় শূন্যরাজ্যে বিলুপ্ত হইতে অগ্রসর হয়। তখন সে বুঝে 'মাঝপথে'ই তাহার যত আনন্দ, কারণ সেখানেই বিশ্ব আছে এবং বিশ্বমধ্যে তাহার সাধের 'আমি' আছে। এই 'আমি' মধ্যের জিনিস, মর্ত্যের বস্তু—একদিকে অন্ধকার পাতালপুরী অব্যক্ত মূলা প্রকৃতির রাজ্য (যেখান

হইতে 'আমি'র উদ্ভব), আর অন্যদিকে আলোকময় অথবা আরও গাঢ় অন্ধকারময় (রহস্যময়) বৈকুণ্ঠধাম, পরব্যোম (যেখানে 'আমি'র লয়)—মধ্যস্থলে 'আমি'র বাস। এই মধ্যভূমি, অর্থাৎ অভিব্যক্ত বিশ্ব ভিন্ন অন্যত্র 'আমিত্ব' (individuality) নাই। আমিত্বই জীবের স্বাতন্ত্র্য, শক্তি এবং প্রাণ। অজ্ঞান-রাজ্য (Unconsciousness) এবং বিজ্ঞান-ধামের (Absolute Consciousness) মধ্যে আত্ম-চৈতন্য-রূপ জীবকণা (self-conscious monad)। ইহা গেল ত' জীবের সর্বস্ব গেল। তবে এ লয় 'প্রকৃতি- লয়' নহে, প্রাণময়ে প্রাণের লয় (পৃঃ ১০, পং ৭), অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী প্রাণের সমষ্টিতে ব্যষ্টি প্রাণের লয়। জলের বিম্ব জলে মিলাইয়া যাওয়াও যেরূপ, এও ঠিক সেইরূপ। যে মহাশক্তির আবর্তনে আমিত্ব-বোধরূপ জীব-চৈতন্য মাঝখানে (between two opposite poles) ফুটিয়া উঠে, সেই চিন্ময়ী শক্তিতে যদি সেই বোধ নিমগ্ন হয় তবে তাহা 'প্রকৃতিলয়' নহে। একটা তীব্র আলোকে ক্ষুদ্র আলোক যেমন অভিভূত হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায় ইহাও সেই-প্রকার অবস্থা। কিন্তু অভিভূত হইলেও জীব সম্পূর্ণরূপে আত্মহারা হইতে পারে না। গতির অবরোধ ভাঙ্গে, বিরামের অবসান হয়, নূতন প্রভাতে নূতন সাজে জীব আবার নূতন করিয়া যাত্রা করে। বিশ্বাতীতের পথে 'বসন্ত-প্রয়াণ' করা ব্যর্থ পরিশ্রম বলিয়া তাহার মনে হয়। তখন সে বিশ্বের পথে যাত্রা করিতে চায়, বাস্তব জগতের দুঃখ-যন্ত্রণা গ্রহণ করিয়া নিজের জীবন সার্থক করিতে চায়, শূন্যময় আদর্শের পশ্চাৎ-ধাবন করিয়া বিশ্ব-বিমুখ হইয়া থাকা আর তাহার ভাল লাগে না। তাই তখন সে চলিতে চায় বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে, তাহাকে ত্যাগ করিয়া শূন্যপানে নহে। এ যাত্রার নাম "মর্ত্যের মহাযাত্রা" (পৃঃ ৫০, পং ১৬), যাহার সাধারণ ইংরেজী নাম 'March of Humanity.' এটি "মানব-সমাজরূপী মহাপ্রাণী''র* যাত্রা (পৃঃ ৫১ ,পং ১৮) অথবা "সমাজ জীবনের ঐতিহাসিক ধারা" (পৃঃ ১০, পং ১৭)

কিন্তু এবার চলিবে সে কোন্ লক্ষ্যের পানে? এ যাত্রার পথ-প্রদর্শক কে?

"That far off Divine Event to which the whole creation moves"-

* দ্রষ্টব্য—পৃঃ ১০, ১৪ ; ৫২৮ , ৭৮, ৬।

সেটি কি? সে অনাগত রূপের বর্তমান আভাস কোথায়? আদর্শ কই?

আছে, সে পূর্ণ আদর্শ (Universal Ideal) আছে—সেটি 'বিশ্বদর্পণ'। সমগ্রভাবে তাহা দেখা যায় না বটে, কিন্তু খণ্ডভাবে তাহা প্রতি জীব-হৃদয়ে বিরাজমান। হৃদয় উপাধি, ইহার ভেদ ও স্বাতন্ত্র্যবশতঃ সেই একই আদর্শ ভিন্ন লোকের নিকট ভিন্নভাবে প্রতিভাত হয়। এই বিশ্বদর্পণ, যাহার এক একটা খণ্ড এক একজন জীবের আদর্শ অথবা প্রাণের দর্পণরূপে প্রকাশিত হইতেছে, ইহাই বিশ্বমানবের আদর্শ অথবা সমগ্র জগতের আদর্শ। ইহাকে এক হিসাবে খণ্ড-আদর্শসমূহের সমষ্টি বলিয়া বর্ণনা করা যায়।

যে যাহা চায় তাহাই তাহার পরম বস্তু, চরমে তাহারই সহিত তাহার সঙ্গমলাভ ঘটে, বর্তমানেও তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া সে চলিতে থাকে—তাহার জীবনের খণ্ড আদর্শে এই পরমানন্দময় বস্তুরই আভাস প্রতিবিম্বিত হয়। এ আদর্শ বিচারের অতীত, উর্ধ্বাধোবিভাগের অতীত, দ্বন্দ্বাতীত। যদিও মানুষ ইহার আভাসকে কখনও উর্ধ্বগামী কখনও বা অধোগামী বলিয়া দেখিতে পায়, তথাপি সে আদর্শ যেমন তেমনই থাকে। তাই ইহাকে "ভগবৎ আদর্শ"ও বলা চলে, (পৃঃ ৫২, পং ৩)—ইহাতে সবই আছে, ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা সকলেরই স্থান ইহাতে আছে, অথচ কিছুরই বিচার নাই। যে যাহাকেই চায় বস্তুতঃ ইহাকেই চায়, ভগবানের এই রূপই সকলকে স্বপ্নবৎ আকর্ষণ করিতেছে, সকলে এই বিশ্বরূপেরই উপাসক—ইনিই বাস্তব ভগবান্। মানব-সমাজ অথবা বিশ্ব-জগৎ ইহারই পানে অবিশ্রান্তভাবে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই পথের নাম "বাস্তবমার্গ" (পৃঃ ৫২, পং ১৬) অথবা "বিশ্বপথ" (পৃঃ ৫২, পং ১১)—The Path of Realism. কিন্তু এ পথ সরল নহে, চক্রাকার—কখনও কুটিল (curvilinear) কখনও বা কুণ্ডলবৎ আবর্তময় (spiral)। এ পথে উত্থান-পতন, আলো-আঁধার পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয় (পৃঃ ৫২, পং ১০—১৪ ; পৃঃ ৮১, পং ১২—১৪)।

ভগবানের যে রূপ পরব্যোমে সেটা মুক্ত, বিশ্বাতীত, তাহাকে লাভ করিবার আশা স্বপ্নমাত্র। আর বস্তুতঃ সে নিরঞ্জনকে কেহ চায় না, সেও কাহাকেও চায় না। মানব সমাজ, ঐতিহাসিক জীবনের ধারা (historic volution) সে শূন্যপানে ধাবিত হয় না।

কিন্তু তাঁর যে রূপ বিশ্বাত্মক, বদ্ধ, সেইটিই সকলের লক্ষ্য। সকলের সকল

প্রকার আদর্শ এই বিশ্বরূপেই পর্যবসিত হয়। এই বিশ্বাত্মক ভগবান্ বদ্ধ, কেন না প্রতিজীবই বদ্ধ এবং জীবসমষ্টিই বিশ্ব। অবশ্য এটা একদিকের কথা। এই দুঃখময় ভগবানের উদ্ধার-সাধন, তাঁহার বন্ধন-মোচনই জীবের কর্তব্য। ইহারই জন্য জীব—মধ্যবর্তী জীব—এ দুঃখের দেশে আসিয়াছে। দুঃখ-ময়কে কারাগার হইতে মুক্ত না করা পর্যন্ত, জগৎজোড়া দুঃখের অবসান না হওয়া পর্যন্ত, তাহার জীবনের ব্রত উদ্যাপিত হইবে না।

এইভাবে আমরা জীবের ক্রম-বিকাশশীল জীবনের মধ্যে তিনটি অবস্থা (moments) দেখিতে পাইলাম। অবশ্য আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে জীবের সত্তা এবং সার্থকতা মাঝে থাকায়—এ পারেও তাহার সত্তা নাই, ওপারেও নাই; এ পারে জড়রাজ্য প্রকৃতি, ওপারে চিন্ময় পরব্যোম অথবা ঐরূপ একটা কিছু; একদিকে ঘোর অন্ধকার, অপর দিকে তীব্র আলো—দুই দিকেই দুই মহাসমুদ্র তাহাকে গ্রাস করিতে চায়। একদিকে সুখ, অন্যদিকে দুঃখ—মধ্যস্থলে জীব উভয়ের মানদণ্ড-স্বরূপ। "অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্ত-মধ্যানি ভারত। অব্যক্তনিধনান্যেব"—এই মধ্যভূমিটাই অভিব্যক্ত। এইখানেই জীবের আপন ক্ষেত্র।

প্রথম এবং দ্বিতীয় অবস্থার ভিতর দিয়া না গেলে জীব নিজের যথার্থ রূপ এবং আদর্শের সংবাদ পায় না। মায়ার রাজ্যে তাহার সার্থকতা নাই, মায়াতীত চিৎসাগরেও নহে—যতদিন সে যোগমায়ার আনন্দ-বাজারে প্রবেশ লাভ না করে, ততদিন সে বিভ্রান্ত হইয়া এদিক্ ওদিক্ ছুটিতে থাকে। মায়িক-জগতে জাগিয়া উঠিয়া সেই যেদিন সে রূপলালসায় পাগল হইয়া উঠিয়াছিল, সেদিন হইতে অরূপের মধ্যে যখন সে আত্মবিসর্জন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তখন পর্যন্ত তাহার জীবনের ইতিহাস একটা ব্যর্থ ভ্রমণ-কাহিনী মাত্র। 'প্রাণের রূপ' দেখিয়া যদিও একদিন সে 'এবার পাইয়াছি' বলিয়া বিশ্রাম করিতে বসিয়াছিল, তথাপি কালের কষাঘাতে তাহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, এ 'পাওয়া' পাওয়া নয়। তাই তার হাতের মাণিক কোথায় আবার খসিয়া পড়িল, তাহার বিশ্রামকাল ফুরাইয়া গেল, তাহার বিশ্রাম-মঞ্চে—নাট্যশালায় উৎসবের দীপ নিবিয়া গেল। ফলে তখন সে সব অস্বীকার করিয়া অতৃপ্ত হৃদয়ের তৃপ্তি-আকাঙ্ক্ষায় সর্বাতীত নিরঞ্জনের অনুসন্ধানে শূন্যপথে রওনা হইল। অনন্ত শূন্যরাজ্য ভেদ করিয়া, সরস্বতী-সহচারিণী

লীলাদেবীর ন্যায়, লোক-লোকান্তর অতিক্রম করিয়া সে Holy Grailএর অন্বেষণে ছুটিল। কিন্তু এ যাত্রায় পরিশ্রমই সার হইল—আদর্শও মিলিল না, প্রাণের পিপাসাও মিটিল না। যেখানে ভোগ্যই নাই—অনন্ত ভোগ্য ত' দূরের কথা, সেখানে ভোগাকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি লাভ করিবে কি প্রকারে? তাই এ যাত্রাও নিষ্ফল হইল। নিষ্ফল হইল বটে, কিন্তু ইহার সার্থকতা আছে। এখানে না আসিলে সে মহাযাত্রার যাত্রী হইতে পারিত না—বিশ্বাতীতের মধ্য দিয়া বিশ্বকে না পাইলে সমগ্রকে অখণ্ডভাবে পাওয়ার উপায় নাই, ত্যাগের ভিতর দিয়া ভোগকে না পাইলে সে ভোগ একটা 'কাম' মাত্র, তাহা 'প্রেম' অথবা 'করুণার' মধ্যে মুক্তিলাভ করিতে পারে না।

তৃতীয় অবস্থায় জীব মহাযাত্রার যাত্রী হইল—যাহা বিশ্বের পথ তাহাই এখন সে নিজের পথ বলিয়া বরণ করিল। এতদিন সে এই পথ হইতে,—"ধরার এই প্রাচীন রাজপথ" (পৃঃ ৫৩, পং ২) হইতে, বিচ্ছিন্ন হইয়াই 'দিশাহারা' হইয়া পড়িয়াছিল (পৃঃ ১০, পং ১৮—১৯)। এই পথের অনুসরণেই তাহার 'সঙ্গম' প্রাপ্তি হয়, যেখানে বিশেষ (Individual) ও শূন্য বা পূর্ণের (Void or Pleroma) সমন্বয় হইয়াছে। এই বিশ্ব একাধারে এক বহু ও শূন্যের সামঞ্জস্য-স্বরূপ।

আমরা একবার সমস্যাটি ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব। জীবের স্বতন্ত্র সত্তা তাহার আমিত্ববোধ-সাপেক্ষ। যখন এই বোধ ছিল না তখন তাহার সত্তাও ছিল না বলিতে হইবে। এই বোধের সঙ্গে তাহার অস্তিত্ব বিজড়িত, তাই এই বোধ সে হারাইতে চায় না। আবার যতক্ষণ তাহার এই বোধ আছে ততক্ষণ সে ক্ষুদ্র, পরিচ্ছিন্ন, ততক্ষণ সে অভাবগ্রস্ত। পূর্ণের (অথবা শূন্যের) মধ্যে সে এই খণ্ডসত্তাত্মক আমিত্ববোধকে আহুতিও দিতে চায় না; কারণ পূর্ণের মধ্যে ডুবিয়া জীব পূর্ণ হইলেও তাহার তাহাতে কোনই লাভ নাই, বরং সর্বনাশ। পূর্ণ যাহা তাহা সর্বদা একভাবেই আছে, পূর্বেও যেমন পূর্ণ ছিল 'আমিত্ব'কে গ্রাস করিয়াও ঠিক তেমনই আছে, কোন বৃদ্ধি নাই। অথচ 'আমিত্ব' গেলে জীবের সর্বস্ব গেল। আর তাহাতে আনন্দই বা কোথায়? এই বিরোধের একটি সামঞ্জস্য চাই।

কিন্তু যে-সব জীব আপন পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য এখনও লাভ করে নাই, তাহাদের জীবনে এইপ্রকার বিরোধের উদয় হয় না। তাহারা স্বভাব অথবা প্রকৃতির

দাস, অন্ধানুবর্তী—পশুপক্ষী যেমন প্রকৃতির প্রেরণায় (instinct) কার্য করে, সে-প্রেরণার প্রতিকূলে গমন করিতে অসমর্থ, ইহারাও তাই। প্রকৃতির মধ্যে যখন যে প্রবাহ খেলে তাহারা স্রোতোমুখে শৈবালের ন্যায় তখন সেই প্রবাহে গা ভাসাইয়া দেয়। তাহাদের স্বাতন্ত্র্য বিশ্ব-নিয়মে চাপা পড়িয়া আছে—অনুসরণই তাহাদের স্বভাব; সুতরাং তাহাদের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রকৃতিরই অঙ্গস্বরূপ—যতক্ষণ প্রকৃতির সঙ্গে ভেদ আছে ততক্ষণ উহা থাকে, পরে সঙ্গমান্তে সব মিলাইয়া যায়; সুতরাং উহা তাহাদের পক্ষে চিরস্থায়ী নহে।

কিন্তু যাহাদের স্বাতন্ত্র্য এবং আত্মবোধ ফুটিয়াছে তাহারা ঐরূপে আত্মসমর্পণ করিতে চায় না। সেই সব জীবকেই সরযূবালা "বিদ্রোহী" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহারা আত্মধর্ম বিশ্বধর্মে ডুবাইয়া দিতে চায় না। কাজেই ইহারা কারণ-সাগর হইতে উত্থিত হইলেও পুনরায় উহাতে নিমগ্ন হইয়া 'প্রাণ' ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। আর যদিও বা কখনও নিমগ্ন হয়, তবুও বিলীন হয় না, আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া ভাসিয়া উঠে। "ক্ষুদ্র বালুকণা হইয়া থাকিব সেও ভাল, তবু যেন পৃথিবীতে পরিণত হইয়া পৃথিবীর বৃহদাকার প্রাপ্ত না হই" (পৃঃ ৫৭)। তাই নির্বাণ-মার্গে ইহাদের তৃপ্তি আসে না, অথচ খণ্ড প্রাণ লইয়াও হাহাকার ঘোচে না, সুতরাং এই বিরোধের একটি সামঞ্জস্য চাই।

প্রশ্ন হইতে পারে, এই সব স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় জীব আপন ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য লইয়া একাকী চুপ করিয়া থাকিলেই ত' পারে। নির্বাণে প্রবেশ না করিল, ব্যষ্টির পশ্চাতেও না ছুটিল, শুধু নিজের একত্ব লইয়া চিদাকাশের এককোণে 'অর্হৎ' অথবা 'কেবলী'দের মতন পড়িয়া থাকিলেই ত' পারে। গ্রন্থকর্ত্রী বলেন, তাহা পারে না—যদি কেহ পারে সে পারুক্, কিন্তু সকলে তাহা পারে না। না পারিবার কারণ আছে। ক্ষুদ্র হইলেও এই সব জীবের হৃদয় স্বচ্ছ, তাই তাহাতে বিশ্বজগতের ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়। কিন্তু সে প্রতিবিম্ব বড় অস্পষ্ট। ক্ষুদ্র প্রাণে অনন্ত জগৎকে হৃদয়ে ধারণ করিতে চায়, কিন্তু পারে না। তাই আবার অতৃপ্তি আসে। খণ্ড লইয়া, আভাস লইয়া, ছায়া লইয়া প্রাণ আরও কাঁদে। পরিণামে রসভঙ্গ হয় ও বেদনার সৃষ্টি হয়।

তাই নূতন যাত্রায় জীবকে চলিতে হয়, যাহাতে ব্যষ্টি নিজেকে না হারাইয়া

সমষ্টিকে পাইতে পারে। সরযূবালা বলেন—জীবের স্বরূপ মাঝে থাকা, সেইখানে থাকিয়াই সে উভয় বিপরীত পক্ষের সমন্বয় করিতে পারে; একদিকে নিরঞ্জন, আর একদিকে সংসার, শুদ্ধ জীবচৈতন্য মধ্যস্থ। "ঐ উপরের আকাশ ছেড়ে এতদূরে থাকিতে মন সরে না। আবার আকাশে, শূন্যে, মিলাইয়া যাইতেও পারি না। মাঝে থাকিতে চাই"।

[৩]

আমরা আলোচনা-প্রসঙ্গে বুঝিতে পারিয়াছি বিরোধ হইতেই দুঃখের সৃষ্টি এবং বিরোধের সামঞ্জস্যেই আনন্দ। কিন্তু কি প্রকারে এই সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে সে একটি কঠিন সমস্যা। চিন্তাশীল মানবের মনে চিন্তা-শক্তির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই কোন না কোন আকারে এই সমস্যার উদয় হয় এবং যতদিন ইহার সদুত্তর লাভ না হয় ততদিন তাহার চিত্ত বিশ্রাম প্রাপ্ত হয় না। জগতের সমবেত দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তা এই একই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণে বিব্রত রহিয়াছে এবং সকলপ্রকার সামাজিক সংস্থান এই একই সমস্যার সমাধান আশায় উদ্ভূত হইয়াছে।

প্রশ্নটি এক—কিন্তু উত্তর অনেক। এই একই প্রশ্ন বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন আকারে উত্থাপিত হইয়াছে, এবং যুগগত সমষ্টি-চিন্তা-শক্তির বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিভিন্নভাবে মীমাংসিত হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান যুগে ঐ মীমাংসা চলে না—এবার একটি নূতন মীমাংসা চাই।

অন্তর ও বাহিরের এই যে বিরোধ ইহা মিটাইবার যত উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে দুইটি প্রধান। একটি প্রাচীন, ভারতীয় এবং সন্ন্যাস-মূলক পন্থা, এবং দ্বিতীয়টি মধ্য-যুগের, পাশ্চাত্ত্য এবং সংসারাশ্রিত পন্থা। (১) মহাযোগী মহাদেবের মনেও একদিন বাসনা জাগিয়াছিল, তিনিও প্রাণের রূপ দর্শন করিতে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু যখন বুঝিলেন যে এ বাসনা তাঁহার মিটিবার নহে, ইহা তাঁহার মঙ্গল-পথের প্রতিবন্ধক, তখন ইহাকে দমন করিলেন। মহাদেব সংসারকে অস্বীকার করিলেন, করিয়া সমাধির অতল সাগরে মগ্ন হইলেন। বাসনা এবং দুঃখ-তাপপূর্ণ সংসারের কোলাহল সে গভীর ব্যোমরাশি ভেদ করিয়া আর তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না,

কারণ—"নাহি রাত্রি দিনমান আদি-অন্ত পরিমাণ, সে অতলে গীত-গান কিছু না বাজে।" নিরোধ অথবা নির্লিপ্ত নিরঞ্জন-ভাব এই পন্থার মুখ্যতত্ত্ব।

(২) মধ্যযুগে ইটালীয় কবি ডান্টের মনেও প্রাণের রূপদর্শন-লালসা জাগিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তিনি মহাদেবের মত সে লালসাকে অস্বীকার করিলেন না। তিনি উহাকে শুদ্ধ করিলেন, স্বর্গীয়ভাবে পরিণত করিলেন, করিয়া উহা দ্বারা তাঁহার মানসী প্রতিমা নির্মাণ করিলেন। এই মানসী-প্রতিমা (Beatrice) তাঁহারই অপার্থিব কল্পনা এবং হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার ঘনীভূত মূর্তিস্বরূপ;—তিনি "আপন মনের মাধুরী মিশায়ে" ইহাকে "রচনা" করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে যে অভাবের পূরণ হইল না, অন্তর্জগতে সে অভাবের পূরণ হইল—মনের মানুষ মিলিল, বিরোধের সমন্বয় হইল, অতৃপ্তির অবসানে আনন্দের নবকরলেখায় কবিবরের অন্ধকার হৃদয়গহ্বর আলোকিত হইল।

এই দুইটি পন্থাকে মোটামুটি দুইটি নামে অভিহিত করা চলে। একটি 'ত্যাগ' (renunciation) অথবা 'বৈরাগ্য' (detachment), অপরটি 'রঞ্জন' (idealism)। সরযূবালা প্রথমটিকে 'ধ্যান' ও দ্বিতীয়টিকে 'অপার্থিব কল্পনা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দুঃখভঞ্জন-সমস্যার এই দ্বিবিধ সমাধান প্রচলিত আছে—কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে গেলে এই দুইটির একটিও যথার্থ সমাধান নহে। জগতে দুঃখ আছে, পাপ-তাপ আছে, হৃদয়ে উৎকট আকাঙ্ক্ষা আছে; এক কথায় সংসার বাসনা-সঙ্কুল দুঃখবহুল—সংসারকে ত্যাগ কর, বাসনার মূল উৎপাটন কর, তাহা হইলেই দুঃখের হাত হইতে মুক্তি পাইবে। ইহাই প্রাচীন পন্থা—'ত্যজ দুর্জন-সংসর্গম্' ইহাই ইহার সার কথা। মধ্যযুগের কবি কিন্তু এ সমাধানে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তিনি বুঝিলেন ইহা কাপুরুষতা—সংসার ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করা কিছু বীরের ধর্ম নয়। তাই তিনি বাসনা ত্যাগ করিয়া মহাশূন্যে অবগাহন করাকে শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিতে পারিলেন না। তিনি মধ্যযুগের প্রতিনিধিরূপে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা বাসনার ত্যাগে নহে, বাসনার শুদ্ধিতে। বাসনামাত্রই দুঃখের হেতু নহে, মলিন বাসনাই সকল-প্রকার অনর্থের মূল। বাসনা শুদ্ধ কর, সংযমাগ্নিতে আকাঙ্ক্ষার মলরাশি ভস্মীভূত কর, তারপর বিশুদ্ধ ভাবের রঙীন চশমা দিয়া জগতের দিকে লক্ষ্য

কর—দেখিবে জগৎ অপূর্ব সৌন্দর্যময়, দেখিবে সর্বত্রই প্রাণের হিল্লোলে হিল্লোলে সুধাধারা বহিয়া যাইতেছে, পাপ-তাপ জগৎ হইতে নির্বাসিত হইয়াছে। নিজের নেত্রে ভাবের অঞ্জন মাখিয়া দেখ, আর কোথাও অভাব দেখিতে পাইবে না। সংসার ত্যাগ করিতে হইবে না, নিজে শুদ্ধ এবং সুন্দর হইয়া সংসারকে শুদ্ধ এবং সুন্দর দেখিতে অভ্যাস কর, ইহাই সাধনা।

গ্রন্থকর্ত্রী বর্তমান যুগের নব ভাবের সাধিকা। তিনি এ সমাধানেও সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি সমস্যার অন্তর্দেশে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে প্রকৃত মীমাংসা এখনও হয় নাই। যতদিন জীব স্বার্থভাবের প্রেরণাতে অনুপ্রাণিত হইয়া অগ্রসর হইবে, ততদিন তাহার পক্ষে বিরোধ-ভঞ্জনের আশা সুদূরপরাহত। চিত্ত যত নির্মল হইবে এই স্বার্থ-সংস্কার ততই তিরোহিত হইবে। শুদ্ধ চিত্তেই যথার্থ সামঞ্জস্যের উদয় হয়। সেইজন্য যতক্ষণ একমাত্র নিজ হৃদয়ের দুঃখচিন্তাই জীবকে ক্লিষ্ট করে,অপরের দুঃখ হৃদয়ে স্বচ্ছতার অভাব-বশতঃ প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না, ততক্ষণ জীব নিজের যথার্থ স্বরূপ (তাটস্থ্য) উপলব্ধি করিতে পারে না। সে কৈবল্য প্রাপ্ত হইতে পারে বটে কিন্তু, কৈবল্যই ত' জীবের প্রার্থনীয় চরম সফলতা নহে। উহা প্রকৃত সিদ্ধির একদেশ মাত্র।

দ্বিতীয় সমাধান অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ইহাতেও দোষ আছে। ইহা অতিরিক্ত ভাবপ্রধান (over-subjective, idealistic), বাস্তবতার গন্ধবর্জিত। স্বার্থ-বাসনা এখানেও একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। এ মতে সংসার ত্যাগের ব্যবস্থা নাই বটে, কিন্তু তাহার উদ্ধারেরও কোন চিন্তা নাই। যে জীব এই ভাব-সাধনার সাধক তাহার রঞ্জিত দৃষ্টির সম্মুখে সমগ্র জগৎ একটি রঙ্গালয়, বিলাসমঞ্চ, লীলানিকেতন। সে যেদিকে তাকায় সেদিকেই নানা রঙের খেলা দেখিতে পায়, আনন্দের অভাব সে কোথাও অনুভব করিতে পারে না। তাহার মনে জগৎ-উদ্ধারের, দুঃখময়ের দুঃখ-বিমোচনের প্রশ্নই উঠে না—উদ্ধার ত' দূরের কথা। অপরের যাহা মর্মভেদী হাহাকার, তাহার নিকট সেটা সঙ্গীতের চিত্তমোহন স্বর-ভঙ্গী বলিয়া প্রতিভাত হয়। প্রথম অবস্থায় জীব যেমন বাহিরের জগৎ ভুলিয়া গিয়া নিজের স্বরূপশূন্যতার দুর্গম অবরোধে কারাবদ্ধ, দ্বিতীয় অবস্থায় জীবও তেমনই নিজের কল্পিত নন্দন-কাননে ভাবমদিরা পানে নেশায় বিভোর। এই 'Palace of Art' হইতে

নিষ্ক্রান্ত হইতে না পারিলে, বাস্তব সংসারের সঙ্গে পরিচিত না হইলে, জীবের সার্থকতা লাভ অসম্ভব। প্রথম অবস্থা শুষ্ক জ্ঞানের, দ্বিতীয় অবস্থা উন্মত্ত ভাবের—উভয়ই কর্মহীন, সুতরাং বহির্জগতের সঙ্গে সম্বন্ধহীন।

সরযূবালা বলেন, বর্তমান যুগের সমাধান ঐরূপে চলিবে না (৫, পং ৮-৯) —ঐ "ধ্যান" এবং "অপার্থিব কল্পনা" অর্থাৎ পূর্বোল্লিখিত জ্ঞান এবং ভাব যতক্ষণ সেবারূপ কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রাপ্ত না হয় ততক্ষণ সফলতার আকাঙ্ক্ষা আকাশ-কুসুমের মত অলীক। জ্ঞান, ভাব এবং সেবা—এই ত্রিধারার সমন্বয়েই ত্রিবেণী-সঙ্গম উদ্ভূত হইবে, যাহার পুণ্য-সলিলে অবগাহন করিয়া জীব নিজ জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিবে।

[৪]

এই ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নান না করিলে জীব প্রকৃত মুক্তিলাভ করিতে পারে না। দুঃখময় ভগবানের উদ্ধার-সাধনেই জীবের জন্ম সফল হয়—এতদ্‌ভিন্ন জীবভাব প্রাপ্তির আর কোনও উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু মায়ার রাজ্য ছাড়িয়া যোগমায়ার রাজ্যে পদার্পণ না করিলে এ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জীব তেমন ভাবে সচেতন হইতে পারে না।

যখন সে সচেতন হয় তখন প্রথম প্রথম তাহার হৃদয় কেমন একটা আন্দোলনে চঞ্চল হইয়া উঠে। কখনও সে সেই অতল সাগরে আত্ম-বিসর্জন দিতে ইচ্ছা করে, আবার কখনও সেই মহাসমুদ্রের তীরভূমিস্থ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণী যোগমায়ার রূপে স্বপ্নাবেশের ন্যায় আবিষ্ট হইয়া পড়ে। যোগমায়ার বিচিত্র প্রভাবে শোক তাপ দূরে চলিয়া যায়, পাপ ও কদাচার আপনিই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, কঠিন ও কর্কশ হৃদয়েও প্রেমের সঞ্চার হয়, আত্ম-বিস্মৃতি ঘটে।

যে জীব একদিন মায়ার কাছে আত্ম-বিক্রয় করিয়া তাহারই রূপ-বিলাসে আপনাকে ভুলিয়া গিয়াছিল, আজ সে যোগমায়ার আড়ম্বর-হীন সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়াছে।

জীব আজ মায়ার শৃঙ্খল ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে। কিন্তু এ বন্ধনের কারণ কি এবং মুক্তিলাভের উপায়ই বা কি? সরযূবালা বলেন এ বন্ধনের কারণ নির্দেশ করা যায় না। খ্রীশ্চীয়ান ধর্মের 'original sin,' হিন্দু-দর্শনের

অনাদিবাসনা অথবা 'অনির্বচনীয়া-মায়া' এই কারণ নির্দেশের ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র। তবে তিনি অনুমান করেন ভগবানই কোন এক "দৈবমুহূর্তে" এ বন্ধন ঘটাইয়াছেন। জীব মায়াকে ভালবাসিয়াছিল, তাহাকে পাইয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছিল, কিন্তু সে আনন্দ স্থায়ী হইল না। তাই তৃষ্ণা মিটিল না, হৃদয়ের ক্ষোভ দূর হইল না, প্রাণের অভাব যেমন ছিল তেমনই রহিয়া গেল—সমস্ত জীবন বিষময় বোধ হইতে লাগিল। মায়াকে ছাড়িয়া যোগ-মায়ার দিকে সেইজন্য তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু অনাথা মায়াকে ত্যাগ করিলে চলিবে কেন? তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে, তবে ত' নিজের উদ্ধার সম্ভবপর। মায়া মুক্ত না হইলে জীবের মুক্তি-আকাঙ্ক্ষা দুরাশা মাত্র।

কিন্তু মায়া কি প্রকারে মুক্ত হইবে? মায়া ত' বিশ্ব-প্রেমিক নহে, সে একে আবদ্ধ, বহুর মধ্যে আত্মপ্রসার করিতে পারে নাই। এক জীবেই সে পরমানন্দ অনুভব করে,—ক্ষুদ্র হইলেও সেই একের দ্বারাই তাহার বন্ধন মুক্ত হইতে পারে। জীব যেমন যোগমায়াকে চায় নিজের তৃষ্ণা নিবৃত্তির জন্য, মায়াও সেইরূপ জীবকে চায় নিজের পিপাসা মিটাইবার জন্য—উভয়েই পরস্পরকে আপন করিয়া শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করিতে চায়। উভয়েরই আকাঙ্ক্ষা এক, তবে উপাধিভেদে পৃথক্ দেখায় মাত্র।

মায়া একজনের মধ্যেই শান্তি চায়, পিপাসা নিবৃত্তির উপায় খোঁজে, তাই সে বদ্ধ ; যখন এক হইতে বহুর মধ্যে এই পিপাসা ছড়াইয়া যাইবে, তখনই সে মুক্তি লাভ করিবে। পিপাসা অসীমে বিস্তৃত না হইলে ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না।

এখন প্রশ্ন এই—মায়া যেমন জীবকে ভালবাসে জীব ত' আর এখন তেমনভাবে মায়াকে ভালবাসিতে পারে না ; যোগমায়াকে দেখিয়া অবধি মায়াকে আর তাহার ভাল লাগে না।

সরযূবালা বলেন—জীব যেন মায়াকে না ছাড়ে, মায়াকে ছাড়িয়া সে যেন অকূল নির্বাণ-সমুদ্রে নিমগ্ন না হয়, তাহা হইলে তাহার 'ব্যক্তিত্ব' হারাইয়া যাইবে, একেবারে সে আমিত্ব-শূন্য হইয়া পড়িবে। সে-সমুদ্রে ডুবিলে ভাসিয়া উঠা বড় কঠিন। জীব যদি সেখানে নিজেকে মিলাইয়া দেয় তাহা হইলে মায়া চিরদিনের জন্য অবলম্বনহীন হইবে। সুতরাং

মায়াকে ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যের পন্থা গ্রহণপূর্বক শূন্যসাগরে ঝাঁপাইয়া পড়া সঙ্গত নহে। বরং মায়ার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা যাহাতে নিবৃত্ত হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। তাহার "দাবী" পূর্ণ করিতেই হইবে।

ইহাই তত্ত্ব। হীনযান অপেক্ষা মহাযানমতেও এই অংশেই মহত্ত্ব। অর্হৎ এবং বোধিসত্ত্বে আদর্শগত অনেক প্রভেদ। করুণা এবং সেবা—ইহাই বর্তমান যুগধর্ম, বোধিসত্ত্ব ইহার আদর্শ। মায়াকে ত্যাগ করা নয়, তাহাকে বিশুদ্ধ করা—ইহাই জীবের প্রধান কর্তব্য। বস্তুতঃ যতক্ষণ মায়ার পিপাসা শান্ত না হইবে ততক্ষণ আমি মায়াকে ছাড়িতে চাহিলেও ছাড়িতে পারিব কেন? আমার প্রতি তাহার আকর্ষণ যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ আমার পক্ষে তাহাকে এড়াইয়া যাওয়া অসম্ভব। এ ঋণ শোধ করিতেই হইবে।

জীব-সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্যও মায়ার বন্ধন-বিমোচন। মায়া একের মধ্যে আবদ্ধ বলিয়া 'কাল-চক্রে'র আবর্তে ঘুরপাক খাইতেছে—এ চক্রের বাহিরে যাইতে হইলে তাহাকে অনন্তের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করিতে হইবে। তাহা না করিলে সে চিরশান্তির সন্ধান পাইবে না। জীবের কর্তব্য এই যে, মায়া যাহাতে কালের গণ্ডি অতিক্রমপূর্বক মুক্তি লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। তাহা না করিয়া যদি সে ঘৃণা অথবা রোষভরে মায়াকে পরিত্যাগ করে তাহা হইলে ভগবানের উদ্দেশ্য অসিদ্ধ থাকিয়া যাইবে।

এই কর্তব্যবোধ যখন জীবের মনে সর্বপ্রথম জাগে তখন একটা বিচিত্র বেদনায় তাহার সমস্ত হৃদয় পীড়িত হইয়া উঠে। একদিকে যোগমায়া অথবা নির্বাণ তাহার শাশ্বত শান্তির শ্বেত-পতাকা দেখাইয়া তাহার চিত্তকে প্রলুব্ধ করিতে থাকে, অপরদিকে নিঃসহায়া অনাথা মায়াদেবীর ব্যাকুল ক্রন্দনরোল তাহার হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া তোলে।

বুদ্ধদেব সম্বন্ধে বর্ণনা আছে যে, যখন তিনি 'বোধি'লাভ করিয়া মহাশূন্যে নিমগ্ন হইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন নিরাশ্রয় জগতের মর্মবেদনা তাঁহার করুণশ্রবণে অখণ্ড রোদনধ্বনিরূপে জাগিয়া উঠিয়াছিল। সেই ধ্বনি শুনিয়া তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। নির্বাণে প্রবেশ না করিয়া তিনি প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন—যতদিন সমস্ত জীব সকলপ্রকার দুঃখ হইতে

চিরদিনের জন্ম মুক্তিলাভ না করিবে ততদিন তিনি প্রতীক্ষা করিবেন সঙ্কল্প করিলেন। মহাযানিগণ বলেন এখনও বুদ্ধ তুষিত স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন, সেখানে হইতে নিরন্তর দুঃখক্লিষ্ট জগতের সেবা করিতেছেন।

এই যে বিরোধ ইহার তাপ বড তীব্র। সাধারণ জীব এ অবস্থায় ব্যাকুল হইয়া পড়ে। জীবসমুদায় পরস্পর এমন অদ্ভুত ঐক্যসূত্রে গ্রথিত যে, একজনকে বাদ দিয়া আর একজন যথার্থ কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারে না। অথচ সর্বত্রই এমন বিরোধ যে, একজনের পিপাসা নিবৃত্তিতে অন্তের পিপাসার অতৃপ্তি অবশ্যম্ভাবী। জীবে ও মায়ায় এই বিচিত্র সম্বন্ধ—ইহাই নিয়তির বন্ধন।

মায়া ক্ষুদ্র, যোগমায়া বৃহৎ; মায়া একরূপ, যোগমায়া অনন্তরূপিণী—বিশ্বপথের পথিক। যোগমায়ার প্রেম গভীর, স্বপ্রকাশ, সর্বব্যাপক; মায়ার প্রেম ক্ষুদ্র। মায়া যদিও সত্যই জগৎকে বেষ্টন করিয়া আছে, তবু সে ক্ষুদ্র, তাই সে অহঙ্কারবশে যোগমায়াকে তুচ্ছ মনে করে। তবে একদিন মায়াকেও যোগমায়ার দ্বারে আশ্রয়প্রার্থিণী হইতে হইবে।

মায়া অপূর্ণ তাই বলিয়াই কি জীব তাহাকে ভালবাসিবে না? জগতে পূর্ণতা প্রাপ্তির উপায় দ্বিবিধ—(ক) স্বভাবের মধ্যে সকলেই একাকী নিরপেক্ষভাবে নিজের স্বতন্ত্র ধারা অবলম্বনে আত্মশক্তি বিকাশ-পূর্বক পূর্ণতা লাভ করে। সেখানে পরস্পরে রাগও নাই, দ্বেষও নাই। (খ) কিন্তু মানব-হৃদয় এভাবে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না, এক হৃদয় অন্য হৃদয়ের সহিত সম্বদ্ধ। সুতরাং একজন আর একজনের সাহায্য বিনা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। তাই জীবকে ছাড়িয়া দিলে মায়ার কল্যাণ নাই—জীবই তাহার সোপানস্বরূপ, যাহাকে আশ্রয় করিয়া সে ভগবান্‌কে জানিতে পারে। রূপকে অবলম্বন করিয়াই অরূপে যাইতে হয়।

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে, জীব যেমন মায়ার সোপান, ঠিক সেইরূপ জীবের সোপান কে? জীব কিন্তু মায়াকে এরূপ সোপান মনে করে না, করিতে পারেও না—তাহার বিশ্বাস মায়া তাহার সোপান-প্রাপ্তি বিষয়ে বাধাস্বরূপ। জীবের পক্ষে যোগমায়াই অরূপ লাভের সোপান, কারণ যোগমায়া অনন্তরূপের 'খণ্ড'রূপ, আর এই অনন্তরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেই অরূপকে পাওয়া সম্ভবপর হয়।

এইস্থানে বিরোধ স্পষ্ট জাগিয়া উঠে। মায়ার ক্ষুধা মিটাইতে গেলেই জীবকে নিজের ক্ষুধা অতৃপ্ত রাখিতে হয়, কারণ একমাত্র যোগমায়াই তাহার ক্ষুধানিবারণে, সুধারস কিংবা আনন্দ প্রদানে সমর্থ—অথচ যোগমায়াকে আশ্রয় করিলেই মায়া আর জীবকে নিজের মতন ভাবে খুঁজিয়া পায় না। কেন না, তখন জীবকে পাইতে হইলে সকলের মধ্যে পাইতে হয়, মায়ার পক্ষে তাহা বিষস্বরূপ। যোগমায়াকে ত্যাগ না করিলে মায়া একেবারে শূন্য হইয়া যায়। আর ত্যাগ করিলেও জীব অতৃপ্ত থাকে, সুতরাং মায়াও অতৃপ্ত জীবের নিকট তৃপ্তি লাভে বঞ্চিত হয়।

বাস্তবিকপক্ষে জীব যতক্ষণ যোগমায়ার আশ্রয় গ্রহণ না করে ততক্ষণ তাহার তৃপ্তি নাই। যে স্বয়ং অতৃপ্ত সে অপরের তৃপ্তি-সাধন কি প্রকারে করিবে? মায়ার হৃদয়ে অনন্তপিপাসা, কিন্তু অনন্ত জলরাশি কোথায়? যোগমায়াই এই অনন্ত জলরাশি, সুধার অনন্ত-প্রস্রবণ। তাই যোগমায়ার শরণাপন্ন না হওয়া পর্যন্ত ক্ষুদ্র জীবের ক্ষমতা কি মায়ার প্রাণের অনন্ত ব্যাকুলতা দূর করে!

এ একটি বিষম সমস্যা। সরযূবালা বলেন ইহার সমাধান আছে। এক কথায় ইহার নাম 'আত্মোৎসর্গ'। যে ক্ষুদ্র, যে অল্পপ্রাণ, সে উৎসর্গ করিতে পারে না। যে বৃহৎ, যে ঐশ্বর্যের সন্ধান পাইয়াছে, তাহাকেই ক্ষুদ্রের জন্য আত্ম-বিসর্জন করিতে হয়। সে যাহা কিছু সাধনা দ্বারা অর্জন করিয়াছে সে সবই ক্ষুদ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া তাহার মঙ্গলকামনায় উৎসর্গ করিয়া দিবে—আর তাহাই পাইয়া সে যে আনন্দলাভ করিবে সেই আনন্দে তাহাকে আনন্দিত হইতে হইবে। ইহারই নাম আত্ম-প্রসাদ; ইহাতে দান-জনিত রিক্ততা থাকে না, একটা পূর্ণতার আস্বাদনমাত্র থাকে। এই ভাবে দাতা এবং গ্রহীতা উভয় পক্ষেই আনন্দ থাকে, কাহারও দাবী অতৃপ্ত থাকে না—জগতের মূলগত ঐক্যসূত্রের একটা প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া যায়। নতুবা বৃহৎ যদি ক্ষুদ্রকে ভুলিয়া কেবল নিজের কল্যাণটাতে আবদ্ধ থাকে, তাহাতে জগৎ অভুক্ত থাকিয়া যায়, আর সেইজন্যই নিজেরও প্রকৃত কল্যাণ সিদ্ধ হয় না। কারণ, দয়াবৃত্তির বিকাশ ও পরিতৃপ্তিতে যে আনন্দ, মহাপুরুষের স্বেচ্ছামূলক আত্মনিবেদনে যে আনন্দ, তাহার তুলনায় কৈবল্যসুখও অতি তুচ্ছ।

ফল কথা এই যে, মায়া যখন আত্ম-প্রসার লাভ করিবে, তখন সে জীবকে

অনন্তের মধ্যে পাইবে, তৎপূর্বে নয়। কিন্তু মায়ার পক্ষে এই আত্ম-প্রসার লাভ জীবের ত্যাগমূলক কৃপাসাপেক্ষ। মায়া ক্ষুদ্র থাকিলে জীবকে একের মধ্যে ভিন্ন পাইবার উপায় নাই। তাই জীবের ত্যাগ অথবা আত্মোৎসর্গে জীব ও মায়া উভয়েরই কল্যাণ।

[৫]

জীবের প্রকৃত স্বরূপ কি? জীবনের উদ্দেশ্য কি? কি উপায়ে জীব সে উদ্দেশ্যের সফলতা সম্পাদন পূর্বক পরমানন্দ লাভের অধিকারী হইতে পারে? এই সব প্রশ্ন চিরদিনই মানবহৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে এবং যতদিন ইহার সদুত্তর প্রাপ্তি না ঘটে ততদিন শান্তির আশা বৃথা। সরযূবালা সমস্যার যে সমাধান প্রকাশ করিয়াছেন আমরা সংক্ষেপে তাহার কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি। এই সমাধান যে বর্তমান যুগোচিত হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে, এবং বর্তমান জগতের চিন্তা-প্রণালী বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে সকল মনীষীই স্ব স্ব প্রতিভা অনুসারে ন্যূনাধিকভাবে এই সমাধানের দিকেই আকৃষ্ট হইতেছেন।

সরযূবালা দেখাইয়াছেন যে 'মাঝে থাকা'ই জীবের স্বরূপ—এবং এই অবস্থা হইতে চ্যুত হইয়াই জীব আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। যদি আবার একদিন সে স্বধামে প্রত্যাবর্তন করিতে পারে তাহা হইলেই তাহার চিরদুঃখের উপশম হইবে, অন্য কোন কৃত্রিম উপায়ে দুঃখনিরোধের সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না। সেবাধর্মই বর্তমান যুগধর্ম, ইহারই অবলম্বনে জীবের স্বধাম-প্রাপ্তি সম্ভবপর।

বৈষ্ণব মহাজনগণ বলেন—জীব শ্রীভগবানের তটস্থ শক্তি। একদিকে সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনীরূপা অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি, অন্যদিকে বহিরঙ্গা মায়া-শক্তি—মধ্যস্থলে জীব। মায়ার আবরণে আত্মবিস্মৃত হইয়া জীব দুঃখের সাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। যেদিন ভগবৎকৃপায় স্বরূপশক্তির স্পর্শ লাভ করিয়া জীব মায়িক জগৎ হইতে মুক্ত হইবে সেইদিনই সে প্রকৃত আনন্দের সন্ধান প্রাপ্ত হইবে, তৎপূর্বে নহে। মুক্ত জীব নিত্যধামে শ্রীভগবানের পার্শ্বচর অথবা সেবকরূপে অনন্তকাল লীলারস সম্ভোগ করে। প্রয়োজন হইলে তাঁহারই

সঙ্গে অথবা স্বতন্ত্রভাবে বদ্ধ জীবের দুঃখোদ্ধার-নিমিত্ত কিয়ৎকালের জন্য প্রপঞ্চ-মধ্যে অবতীর্ণ হয় এবং নির্দিষ্ট কার্য সাধনানন্তর স্বধামে প্রত্যাগমন করে।

সরযূবালার মতেও জীবের স্থান মধ্যে, কিন্তু তাঁহার দার্শনিক ভিত্তি একটু বিভিন্ন। সেইজন্য বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত যে যুগল-প্রেমের এত মহিমা কীর্তন করিয়াছেন, তিনি তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া তৃতীয়ের আবশ্যকতা দেখাইতে যত্ন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে প্রেম দ্বন্দ্বের মধ্যেই পর্যবসিত, যাহাতে তৃতীয়ের স্থান নাই, সে প্রেম প্রেম নহে—তাহা স্বার্থপরতার নামান্তর। ভেদ এবং অভেদ উভয়ের সামঞ্জস্যে প্রেমের প্রকাশ ;—বিরহের প্রয়োজকরূপে অথবা মিলনের সংঘটকরূপে তৃতীয়ই ভেদাভেদের প্রতিষ্ঠাভূমি। যেখানে তৃতীয় নাই, সেখানে যথার্থ প্রেমের সম্ভাবনা নাই।

আমরা বর্তমান প্রবন্ধে বৈষ্ণব মহাজনগণের প্রেমমাহাত্ম্য-খ্যাপনে প্রবৃত্ত হই নাই, সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্তসমূহ প্রদর্শন এবং বিস্তৃতরূপে আলোচনা-পূর্বক গ্রন্থকর্ত্রীর খণ্ডনোদ্ধারে যত্ন করিব না। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু গ্রন্থকর্ত্রীর স্বমতের আলোচনা।

একটু নিবিষ্টভাবে জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা সর্বপ্রথমেই যে চিত্রখানা দেখিতে পাই তাহা সুখ-দুঃখের মিশ্রিত ছবি। কিন্তু সুখ-দুঃখ ত' বর্তমান অবস্থায় এক বলিয়া স্বীকার করা কঠিন, তাই উভয়ের আধারও আপাততঃ ভিন্ন বলিয়াই মানিয়া নিতে হইবে। সুতরাং জগতের যে রূপ আমরা দেখিতে পাই তাহার এক প্রান্তে সুখময়ের ছবি, অপর প্রান্তে দুঃখ-ময়ের ছবি অবস্থিত। কিন্তু সরযূবালা বলেন—সুখময় এবং দুঃখময় পরস্পর বিভিন্নভাবে প্রতীয়মান হইলেও মূলতঃ উভয়ই একই বস্তু। তিনিই পূর্ণ ভগবান্, যিনি একাধারে সুখময় এবং দুঃখময় উভয়াত্মক হইয়াও স্বরূপতঃ উভয়ের অতীত। তাঁহার যে রূপ জগতের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত, নিষ্প্রপঞ্চ, সেটি সুখময় ; আর যে অংশ জগদ্ব্যাপক, বিশ্বকে আচ্ছাদন করিয়া আছে, সেটি দুঃখময়। জগতের একটি প্রাণীরও দুঃখ যতদিন নিরুদ্ধ না হইবে ততদিন দুঃখময় ভগবানের উদ্ধার নাই, অথবা বিপরীতপক্ষে যতদিন দুঃখময় ভগবান্ কারা-মুক্ত না হইবেন ততদিন জগৎ হইতে দুঃখের ছায়া সম্পূর্ণভাবে অপগত হওয়া সম্ভবপর নহে। বস্তুতঃ দুঃখময় একজন এবং দুঃখও এক বই দুই নয়। সেই একজনের এক দুঃখই কোটি প্রাণীর কোটি দুঃখরূপে খণ্ড বিখণ্ডভাবে প্রতীত

হইতেছে। এই বিচ্ছিন্ন ব্যষ্টিভূত দুঃখ আধ্যাসিক, ইহা ভুলিতে হইবে। সমষ্টি দুঃখের অনুরোধে নিজের ব্যক্তিগত দুঃখের মিথ্যাত্ব অনুভব করিতে হইবে। আমার দুঃখ বাস্তবিক দুঃখ নহে, সেই মূলীভূত এক দুঃখেরই মায়িক প্রতিবিম্ব মাত্র—এইটি বুঝিলেই আপনা ভুলিয়া নররূপী নারায়ণের, বিশ্বমানবের (Universal Humanity) দুঃখ দূর করিতে সামর্থ্য আসিবে, জগতের সেবা করা সম্ভব হইবে, দুঃখময়ের উদ্ধার-ব্রত সফলতা লাভ করিবে। সেবাই বর্তমান যুগের ধর্ম। ভগবান্—দুঃখময় ভগবান্—কাঁদিয়া আজ জীবের দ্বারে সেবাপ্রার্থী, তিনি যেন আজ ফিরিয়া না যান। অতএব হে জীব! ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়, Knight-errant এর মতন জীবের সেবায় বদ্ধপরিকর হও, চরমে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া জীবন সার্থক বোধ করিতে পারিবে। বর্তমান যুগের 'কর্তব্য' সম্বন্ধে সরযূবালার ইহাই প্রধান অনুশাসন বলিয়া মনে হয়। Christ যে Charityর কথা বলিয়াছেন, চৈতন্য যে জীবে দয়া শিখাইয়াছেন, শাস্ত্র যে 'দানমেকং কলৌ যুগে' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, ইহাও তাহাই। সকলেরই তাৎপর্য সমান, অর্থাৎ এ যুগে প্রেম ভিন্ন পথ নাই।

কিন্তু জগতে দুঃখবহুলতার কারণ কি? দুঃখ কোথা হইতে আসিল, কেন আসিল, কবে আসিল? ইহার সার্থকতা কি? ইহার কোনও গভীর নৈতিক উদ্দেশ্য আছে কি না? প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগ পর্যন্ত এ সমস্যার উত্তর নানাদিক হইতে নানাভাবে করিবার চেষ্টা হইয়াছে। সরযূবালাও ইহার একটা উত্তর দিয়াছেন। এই সম্বন্ধে তিনি যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিলে বিশ্বাস হয় তাঁহার মতে চরম দৃষ্টিতে দুঃখ একটি খেলা মাত্র। ভগবান্ পূর্ণানন্দময়, এই আনন্দের ভাণ্ডার সর্বদা পূর্ণ এবং তাই যেন সময়ে সময়ে (?) উচ্ছ্বাস উঠিলে সে 'অনন্ত' আধারেও রস আর ধরে না, যেন সে উদ্বেলিত রসধারা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু পড়িবে কোথায়? তার জন্য একটি পাত্র চাই। তাই তখন তাঁহা হইতে দুঃখময়ের আবির্ভাব হয়—দুঃখময়ই এই উচ্ছ্বসিত রস-প্রবাহের ধারণসমর্থ পাত্র অথবা আধার। কিন্তু এই দুঃখময় ত অপর কেহ নহে, এ যে তিনি নিজেই। তাই বলিতে হয় তাঁহার আনন্দ তাঁহাতেই আসিয়া ঢলিয়া পড়ে। একহাতে যিনি দাতা, আর একহাতে তিনিই

গ্রহীতা। তিনিই একাধারে প্রেমিকও বটে, প্রেমপাত্রও বটে—আবার প্রেমও তাঁহারই রূপ।

বুঝিলাম প্রেমিক-প্রেমাধার, দাতা-গ্রহীতা—সবই তিনি। সুখময়ও তিনি, দুঃখময়ও তিনি। তবে আমি কি? জীব কি? সরযূবালা বলেন, জীব "এই দানলীলার বিলাসভূমি", জীব মধ্যবর্তী (medium)—জীবের মধ্য দিয়াই এই লীলা সম্পন্ন হয়। দান হয় জীবের মধ্যবর্তিতায়, গ্রহণও তাহাই; অর্থাৎ দুঃখময়ের সেবা করিতে হইলে জীবের মধ্য দিয়াই করিতে হইবে। আমরা যখন জীবকে দিই মনে করি, তখন বাস্তবিক জীবকে দিই না, দিই তাঁহাকে (দুঃখময় ভগবান্‌কে); যখন জীবের নিকটে পাই তখনও বস্তুতঃ জীবের নিকট হইতে নহে, তাঁহারই (সুখময় ভগবানের) নিকট হইতে পাই। জীব কেবল মধ্যে থাকে মাত্র, জীব এই লীলার সহায় মাত্র—জীব দেয়ও না, নেয়ও না। অর্থাৎ কর্তৃত্ব জীবে নাই, দানেরও নহে, গ্রহণেরও নহে।

সুখময় একদিকে, দুঃখময় অপরদিকে—জীব মধ্যে; তাই জীব তৃতীয়। এই তৃতীয়ের বাণী সরযূবালা বিভিন্ন দিক্ হইতে এবং বিভিন্ন প্রকারে প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

জীব মাঝে আছে, তাই সুখময়-দুঃখময়ে এ ব্যবধান। জীব উভয়ের মধ্যে "বাধা।"

আবার জীব মাঝে বলিয়াই সুখময়-দুঃখময়ের মিলন সম্ভব হয়। জীব উভয়ের যোজক, বন্ধন "সেতু"।

ইহার তাৎপর্য এই যে 'আমিত্ব' না থাকিলে লীলা হয় না—"আমি" ছাড়িলে বিরহও নাই, মিলনও নাই।

বায়রন

"And poor proud Byron! Sad as grave,
And salt as life; for lonely brave,
And quivering with the dart he drave."

E. B. Browning

কিঞ্চিন্ন্যূন এক শতাব্দীকাল অতীত হইতে চলিল, বায়রনের জ্বালাময়ী প্রতিভা চিরকালের নিমিত্ত নির্বাপিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রতিভা নির্বাপিত হইলেও তৎপ্রসূত ফলরাজি আজিও বিদ্যমান থাকিয়া মানবমণ্ডলীর সুখ-দুঃখের বিধান করিতেছে স্বাধীন চিন্তার বিজয়-পতাকা উড্ডীন দেখিলে ভাবুকের নয়নে আনন্দাশ্রু উদ্গত হয়, আজিও স্বেচ্ছাচারী উৎপীড়কের বিরুদ্ধে পদদলিত ন্যায়ধর্মের প্রতিষ্ঠাকল্পে লোকের উদ্যতবাহু দেখিতে পাওয়া যায়—ইহা বায়রনের প্রভাবজাত অমৃতময় ফল। আবার বিষফলও আছে—কারণ এখনও যুবক-সমাজ হইতে স্বৈরাচার, উচ্ছৃঙ্খলতা, অসংযত আবেগ-উচ্ছ্বাসের প্রবাহ একেবারে তিরোহিত হয় নাই। এখনও যুবকদিগের অন্তঃকরণে নৈরাশ্য-প্রিয়তা ও মানবজাতির প্রতি আন্তরিক ঘৃণা সময়ে সময়ে বিরাজমান দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বলিতে হয় বায়রন গিয়াছেন, তাঁহার প্রতিভাও পশ্চিমের দিগন্তশিখরে অস্তমিত হইয়াছে, কিন্তু দিক্‌চক্রবালের নিম্নভূমি হইতে শতাব্দীর নিবিড় কুহেলিকা ভেদ করিয়া সেই প্রতিভার বিচ্ছিন্ন করলেখা এখনও স্থানে স্থানে প্রভাসমান হইতেছে, এবং সেই আলোকে আলোকিত হইয়া দুই একটি তরুণ কবি অথবা কবি-হৃদয় অথবা দুই একটি তরুণ যুবক আপনাদের মনোবীণায় সময়ে সময়ে ঝঙ্কার দিতেছেন। বায়রন আমাদিগকে সুশিক্ষা অথবা কুশিক্ষা দান করিয়াছেন, তাহার বিচার করিতে গেলে মতভেদ অবিসংবাদিত—এ বিবাদ আজিকার বিংশ শতাব্দীর বিবাদ নহে, ইহা বহু দিনের বিবাদ, তাঁহার জীবদ্দশাতেই এতৎ সম্বন্ধে পণ্ডিতবর্গের মধ্যে ঐকমত্য ছিল না। কারলাইল

তাঁহার বিরুদ্ধে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে দণ্ড ঘোষণা করিয়াছিলেন, অথচ কারলাইলের গুরুস্থানীয় মহাকবি গেটে (Goethe) তাঁহাকে যথোচিত সম্মানে অলঙ্কৃত করিতে বিস্মৃত হন নাই। সাদি (Southey) তাঁহাকে দানবীয় কবিদলের অগ্রণী (Leader of the "Satanic School of Poetry") বলিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন, অথচ মহামতি ম্যাটসিনি আপনার মহৎ জীবনের একমাত্র কর্ণধার বলিয়া ভক্তিবিনম্রচিত্তে তাঁহার উল্লেখ করিতেন। এরূপ মতবৈষম্য সর্বাংশেই স্বাভাবিক—কিন্তু এই মতবৈষম্যের অন্তরালে তাঁহার প্রতিভার মহত্ত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারিতেন না। আজ আমরা এই বিজয়িনী প্রতিভার সম্মুখীন হইতে চেষ্টা করিব।

বায়রন যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন সমগ্র য়ুরোপীয় সমাজ অশান্তিপূর্ণ—দেশে অরাজকতা, সাহিত্যে শৃঙ্খলারাহিত্য, রাজনীতিতে মতবিপর্যয়—সর্বত্রই তখন পুরাতন ভাঙ্গিয়া তাহার ভগ্নাবশেষের উপর নূতনের একটা ভিত্তি-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে। ফরাসী-বিপ্লব এই চেষ্টারই অন্যতম ফল। কাহারও মনে সন্তোষ নাই, সুখ নাই, শান্তি নাই—সকলেরই হৃদয় পুরাতনের প্রতি বিদ্রোহপ্রবণ হইয়া নূতনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। যাহা ছিল তাহা আর ভাল লাগে না, তাহাতে যেন আর কুলায় না, তাহা যেন যথেষ্ট নহে, এই একটা ভাব তখন সকলের মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল অথচ হাত বাড়াইয়া এমন কিছু পাওয়া যায় নাই—যাহাতে হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইতে পারে। কি সাহিত্য, কি সমাজ, সর্বত্রই অত্যাচারীর প্রতি বিদ্রোহ, সর্বত্রই সাম্যের প্রতি অনুরাগ, সর্বত্রই ন্যায়, ধর্ম ও স্বাধীনতার প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ তখন পরিলক্ষিত হইত। কিন্তু হৃদয়ের আদর্শানুযায়ী সমাজ অথবা সাহিত্য তখন ছিল না; কারণ যেখানে একনিষ্ঠ প্রভুত্ব সেখানে ন্যায় অথবা সাম্য থাকিতে পারে না। সুতরাং তখন কেবল "নাই, নাই" ও "ভাঙ্গ, ভাঙ্গ" রব চতুর্দিকে শ্রুত হইত। ইহার ফলেই ফরাসী-বিপ্লবের দিগ্‌দাহকারী দাবানল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল—যাহা মন্দ, যাহা অপবিত্র, যাহা দেশের ও দশের অহিতকারী তাহা পুড়িয়া খাক্ হইয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে যাহা ভাল, যাহা মনোমোহন, যাহা সমাজ ও সাহিত্যের পরিপোষণকল্পে সহায়, এমন অনেক জিনিষও নষ্ট হইল। স্থূলকথা, সুদক্ষ পরিচালকের অভাবে, অথবা বিধিনির্বন্ধে, বিপ্লব আশানুরূপ শুভফল প্রসব করিতে পারে নাই।

ঠিক এই বিপ্লবের যুগেই বায়রনের জন্ম, সুতরাং বায়রন যে বিপ্লবের কবি তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কিন্তু শুধু বিপ্লবের কবি বলিলেই ত বায়রনের পরিচয় দেওয়া হয় না; বিপ্লবের কবি ত অনেকেই ছিলেন—শেলী, কোলরিজ, এবং প্রথম প্রথম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ইঁহারা সকলেই বিপ্লবের কবি। অথচ ইঁহাদের মধ্যে চরিত্রগত, আদর্শগত ও পদ্ধতিগত কত ব্যবধান। একটা উদাহরণ দিতেছি। অত্যাচার প্রভুত্ব এবং স্বেচ্ছাচারের হস্ত হইতে মানবজাতির বন্ধনশৃঙ্খল উন্মোচন করিবার জন্য শেলী এবং বায়রন উভয়েই লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন—উভয়েই কপটতার ঘোর শত্রু, শান্তির দূত, সাম্যের পথপ্রদর্শক—কিন্তু উভয়ের কত প্রভেদ। বায়রনে কেবল কান্না, কেবল তর্জন, কেবল গর্জন, কেবল হা-হুতাশ —তাঁহার Childe Harold ই বলুন আর Isles of Greece*ই বলুন, সর্বত্রই ঐ এক রব। তিনি নিজে মাতিয়াছেন, পরকে মাতাইয়াছেন। কৈশোরের প্রারম্ভ হইতে বিদেশে, বিভূমে দেহাবসান পর্যন্ত ঐ এক চিত্ত-বিমোহন স্বাধীনতার সুরে তাঁহার সমস্ত জীবনতন্ত্রী বাঁধা ছিল—যখন যে তারে ঘা পড়িত, ঐ এক সুরেই বাজিয়া উঠিত। কিন্তু শেলীর কথা স্বতন্ত্র; তিনি নিজে বড় মাতিতেন না, অথবা মাতিলেও তাহা অন্যকে বড় জানিতে দিতেন না। তিনি তাঁহার প্রিয় চাতক পক্ষীর ন্যায় কল্পনার পক্ষে ভর করিয়া উধাও হইয়া নীলাকাশে উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেন, আর চারিদিকে আপনার সুধামাখা স্বরলহরী বর্ষণ করিতেন—নিম্নে যে শত দুঃখে জর্জরিত, শত অত্যাচারে প্রপীড়িত কষ্টবহুল সংসাররঙ্গভূমি পড়িয়া রহিয়াছে, সে কথা তাঁহার স্মরণ থাকিত না—তিনি মনে মনে স্বাধীনতার লীলানিকেতন, ন্যায়ধর্মের আশ্রয়স্থল গঠন করিয়া আনন্দে মাতোয়ারা হইতেন। তাঁহার Queen Mab, Revolt of Islam, ও Prometheus Unbound এর ইহাই মূলমন্ত্র। উভয়েই বিপ্লবের কবি, অথচ উভয়ের কত ব্যবধান। তাই বলিতেছিলাম, শুধু বিপ্লবের কবি বলিলেই কবির পরিচয় দেওয়া হয় না। তবে কিসে হয়? এ কথার উত্তর বড় কঠিন। কিন্তু কবি কি তাহা না বুঝিলে বিপ্লবের কবি কি বুঝা যায় না।

যে দিব্য আলোকে কবির নয়ন উদ্ভাসিত, সে আলোক জলে নাই, স্থলে

* Don Juan এর ৮৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

নাই, নভোমণ্ডলে নাই, * অথচ তাহাতেই নয়নের অগম্য স্থান, বুদ্ধির অগোচর তত্ত্ব মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুদ্‌বিকাশবৎ আলোকিত হইয়া উঠে, তাহাতেই জগতের বিচিত্র রহস্য-যবনিকা মুহূর্তের জন্য অপসৃত হয়; তাহাতেই মুহূর্তের জন্য তত্ত্ব ও সৌন্দর্যের 'ত্রিলোকনন্দিনী মূর্তি' আমাদের মানসচক্ষে প্রতিভাত হইয়া উঠে। এই দিব্য আলোকের নাম কল্পনা, এবং এই আলোক যাঁহাতে যত অধিক পরিমাণে বিদ্যমান তিনি তত বড় কবি। কবিত্বের আর এক উপাদান আছে, তাহা অনুভাবকতা। যিনি যত বেশী অনুভব করিতে পারেন, তিনি তত বড় কবি—যিনি নিজের দুঃখ ভুলিয়া পরের সুখে সুখী হইতে পারেন, তিনি কবি; যিনি নিজের সুখ ভুলিয়া পরের দুঃখে দুঃখী হইতে পারেন, তিনিও কবি; যিনি প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে পারেন, তিনিও কবি। আমি কপট হাস্য অথবা মায়া কান্নার কথা বলিতেছি না—চূড়াধন বাবুর হাস্য অথবা কান্না প্রকৃত হাসিকান্না নামের যোগ্য নহে, উহা সাংসারিকতারই প্রকারভেদ মাত্র। যিনি প্রকৃত প্রস্তাবে হাসিতে জানেন কিংবা কাঁদিতে জানেন, তিনিই কবি। আর এই বিচিত্র সংসারে সুখদুঃখ হাসি-কান্না কাহার না আছে? সুতরাং একহিসাবে সংসারের সকলেই কবি। অবস্থার আঘাতে, সংসারের তাড়নায়, নৈরাশ্যের ব্যাকুলতায় যখনই কাহারও প্রাণ আনচান করিয়াছে, যখনই কাহারও নেত্র-যুগে অশ্রু উদ্গত হইয়াছে, তখনই তাহার অন্তরে অন্তরে তলবাহিনী ফল্গুনদীর ন্যায় কবিতাধারা প্রবাহিত হইয়াছে—সে বুঝুক্ আর না বুঝুক্, স্বীকার করুক আর না করুক্, মনে মনে সে তখন কবি বটে। কিন্তু অব্যক্ত কবি, ইহার সঙ্গে আমাদের কোনও সম্বন্ধ নাই—সুতরাং সে কথা থাক্। প্রকৃত কবি তিনি, যাঁহার অনুভাবকতা অতি প্রবল, বিশ্লেষণ-শক্তি অতি তীক্ষ্ণ, এবং নিজের অন্তর্নিহিত ভাবরাজি ভাষা-সংযোগে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা অতি-অসাধারণ। তিনি নিজে কাঁদিয়া পরকে কাঁদান, নিজে হাসিয়া পরকে হাসান—নিজের ভাবে তিনি পরকে বিভোর করিয়া তোলেন। তিনি যদি জগতের সৌন্দর্য উপলব্ধি করিয়া থাকেন, তাহার কবিতা পড়িয়া আমরাও জগৎকে সুন্দর দেখি—তিনি যদি প্রেমিক হন, তাঁহার কবিতা পাঠে আমাদের শুষ্ক হৃদয়ও প্রেমের বন্যায় প্লাবিত

* "The light that never was on sea or land. "The Consecration and Poet's Dream". Wordsworth.

হইয়া যায়—কবিত্বের এমনই শক্তি! এই কথা সদসৎ উভয়পক্ষেই খাটে। সুতরাং তাহা হইতে আমরা সুশিক্ষা ও কুশিক্ষা উভয়ই পাইতে পারি। এই হিসাবে বিচার করিয়া দেখিলে বায়রনকে অতি বড কবি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার অধিক পরিমাণ দূরদৃষ্টি ছিল না, স্বীকার করি। চিত্তের অণুবীক্ষণিক পর্যবেক্ষণে তিনি অপটু ছিলেন, তাহা জানি; তাঁহাতে সেক্ষপীয়রের মানব চরিত্রজ্ঞান, মিলটনের উদাত্ত ভাব, শেলীর ইন্দ্রজাল, ওয়ার্ডসওয়ার্থের গভীরতা, ব্রাউনিং এর আশ্বাস, টেনিসনের পাণ্ডিত্য, কিছু ছিল না—তাহা মানি; আদর্শচরিত্র আঁকিয়া তিনি জগৎকে পরোক্ষভাবে নীতিশিক্ষা দিতে চেষ্টা করেন নাই, তাহাও সত্য কথা—তথাপি তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কবি*। যদি ভাবময়ী বাণী (Impassioned speech) কবিতার লক্ষণ হয় তবে তিনি উৎকৃষ্ট কবি—অত ভাব, অত আবেগ, অত উৎকণ্ঠা অত চঞ্চলতা, আর কোথাও আছে কি? যে গুণে রুসোর New Heloisa অথবা Confessions এবং চন্দ্রশেখরের 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' গদ্যে লিখিত হইয়াও কাব্যশ্রেণীতে পরিগণিত হয়, সেই গুণে বায়রন কবি। অথবা 'জীবন-সমালোচনা'ই (Criticism of life) যদি কবিতার নির্দিষ্ট লক্ষণ হয়, তাহা হইলেও বায়রন কবি। কারণ, বায়রনের কবিতার পঙ্‌ক্তিতে, পঙ্‌ক্তিতে, পদে পদে, জীবনের অভাবাত্মক সমালোচনা পরিদৃষ্ট হয়। জীবনে সুখ নাই, শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই—কেবল একটা অপূর্ণ কামনা, একটা শূন্যময় হাহাকার, একটা ঘোর বিষাদ-ছায়া ব্যতীত আর কোথাও কিছু নাই। ইরান কবি ওমর খৈয়ামের মত বায়রনও বুঝিয়াছিলেন—

> For in and out, above, about, below
> 'Tis nothing but a Magic—Shadow-Show,
> Played in a box where candle is the Sun
> Round which we phantom figures
> Come and go.

---

* জেফ্রি, কারলাইল, অথবা সাদি নাসিকাকুঞ্চন করুন্ আমাদের আপত্তি নাই, একথা আমরা প্রত্যাহার করিব না। গেটে আমাদের সহায়, জগতের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ আমাদের মতের অনুমোদক। আমরা সত্যের অপলাপ করিব না। তবে কবিতা-বিচারের অন্যান্য বহুবিধ মানদণ্ড আছে। সে সব সমালোচনা-পদ্ধতি আমরা অন্যান্য কবিদের বর্ণনা-প্রসঙ্গে আলোচনা করিব।

তিনি জীবনের মদিরা পেয়ালা ভরিয়া পান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার রসনা তিক্ত হইয়া গিয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ইহাতে মাধুর্য নাই। স্বকৃত দোষে, আত্মসংযমের অভাবে, এবং অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতার ফলে তাঁহার জীবন অন্ধকার হইয়াছিল, তাই তিনি আজীবন কাঁদিয়া গিয়াছেন। ইহাই জীবনের অভাবাত্মক সমালোচনা। আবার ভাবাত্মক সমালোচনাও আছে—যেমন ব্রাউনিংএর। তিনি দুঃখের মধ্যে সুখের বীজ দেখিতে পাইতেন, তিনি অমঙ্গলকে মঙ্গলের নিদান বলিয়া বুঝিতেন, তিনি জগতের সমস্ত অশান্তি উপদ্রবের অভ্যন্তরে আনন্দময়ের কল্যাণ-স্পর্শ উপলব্ধি করিতেন, ফলে তাঁহার চক্ষে জীবন সুরম্য নন্দনকাননের ন্যায় মনোহর বোধ হইত। সুতরাং তাঁহার আশ্বাসবাণীতে তাপিতের অশ্রুজল মুছিয়া যায়, নিরাশের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়। যাহা হউক, ব্রাউনিং জীবনের যে অংশ দেখিয়াছেন বায়রন সে অংশ দেখেন নাই, তাহার বিপরীত অংশ দেখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সমালোচনাও জীবন-সমালোচনা ব্যতীত আর কিছু নহে। সুতরাং বায়রনকে কবি বলিয়া স্বীকার করিতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। আর অত দিয়াই বা কাজ কি? কবিত্বের মানদণ্ড পাঠকের অন্তঃকরণ; কোন্ পাঠক Childe Harold এর তৃতীয় এবং চতুর্থ সর্গ, Don Juan এর অংশ বিশেষ, Manfred, Cain প্রভৃতি গ্রন্থ সহজে বিস্মৃত হইতে পারিবেন?

বায়রনকে বিপ্লবের কবি বলিয়াছি কেন, তাহা একটু খুলিয়া বলি। এক হিসাবে সাধারণতঃ কবিমাত্রকেই প্রতিপাদ্য বিষয় ও পদ্ধতি অনুসারে দুইটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়।

কেহ কেহ মনে করেন, মানুষ সমাজবদ্ধ জীব—মানুষের কতকগুলি সামাজিক বন্ধন আছে, কতকগুলি কর্তব্য, কতকগুলি দায়িত্ব আছে—তাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত, সুতরাং তাহা লঙ্ঘন করা পাপ। সুখে থাক, অথবা দুঃখে থাক, যখন যে কোন অবস্থায় থাক না কেন, অনেক লোকের সুখশান্তি তোমার উপর নির্ভর করিতেছে, এ সব ভুলিও না—তজ্জন্য উদ্যম কর, সত্য এবং ন্যায়পরতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নিজের বাসনা সংযত কর, নিজের সুখ, বিলাস এবং প্রয়োজন হইলে নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দাও; দেখিবে ইহাতেই নিজের সুখ এবং সমাজের মঙ্গল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ এই শ্রেণীর কবি।

আর এক শ্রেণীর কবি আছেন—তাঁহারা মনে করেন, প্রত্যেক ব্যক্তি স্বতন্ত্র, একজনের সঙ্গে আর একজনের প্রকৃত প্রস্তাবে কোনও সম্বন্ধ নাই, সকলেই পৃথক এবং আত্মসম্পূর্ণ। মানুষ ব্যক্তিগত আচরণ এবং সুখ-দুঃখ হইতে শিক্ষা লাভ করে। সুতরাং তাঁহাদের মতে প্রত্যেকেরই নিজের নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা উচিত। প্রেম এবং দয়ার বন্ধন তাঁহাদের নিকট শৃঙ্খলমাত্র, তাহা ছিন্ন করিয়া তাঁহারা সর্বপ্রকার সামাজিক দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। আত্মকৃত অথবা অন্যকৃত সকল প্রকার বন্ধনই ইঁহাদের অসহ্য। বায়রন এবং শেলী এই শ্রেণীর কবি।

সুতরাং বিপ্লবের কবি বলিলে এই শেষোক্ত শ্রেণীর কবিকেই বুঝিতে হইবে। বায়রন এবং শেলীতে বিপ্লববাদিত্ব বিষয়ে যে পরস্পর প্রভেদ আছে তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। অবশ্য, ওয়ার্ডসওয়ার্থও এক হিসাবে বিপ্লবের কবি বটে—কারণ তাঁহার ন্যায়-নিষ্ঠ হৃদয় অন্যায় প্রভুত্ব এবং বন্ধনের উপর স্বভাবতই বিদ্রোহপ্রবণ ছিল; কিন্তু তাঁহাতে ও বায়রনাদিতে পার্থক্য এই যে, তিনি অন্যায় বন্ধনকে অস্বীকার করিলেও স্বকৃত কোন-না-কোন প্রকার বন্ধন মানিয়া চলিতেন, আর বায়রনাদি কোন বন্ধনই সহ্য করিতে পারিতেন না। তাই ফরাসী বিদ্রোহের অগ্নি যখন প্রধূমিত হইয়া উঠিয়াছিল সেই সময়কে লক্ষ্য করিয়া যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলিয়াছিলেন, এমন সময়ে জীবনধারণও একটা আনন্দের বিষয়—সেই ওয়ার্ডসওয়ার্থই বিদ্রোহীদের অত্যাচার এবং রক্তপাতাদি দর্শনে শিহরিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু বায়রন স্বাধীনতার সংগ্রামে কখনই বিমুখ হইতেন না। তাঁহার মৃত্যুকালীন বাক্য, "Forwards, forwards, follow me", পাঠকগণ মনে রাখিবেন।

এই ত গেল তাঁহার স্বাধীনতা-প্রিয়তার কথা। কিন্তু তাঁহার বিপ্লববাদিত্ব অন্য বিষয়েও পরিলক্ষিত হইত। তাঁহার ধর্ম-বিশ্বাস এ বিষয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁহার প্রকৃত ধর্মবিশ্বাস কি ছিল বলা কঠিন, কারণ উহাতে কালক্রমে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল; তবে ইহা নিশ্চয় যে তিনি প্রচলিত খ্রীষ্টধর্মে আস্থাবান ছিলেন না। তাঁহার বাল্যবন্ধু Hodgson এবং অন্যান্য অনেকেই বিবিধপ্রকারে খ্রীষ্টধর্মে তাঁহার লুপ্তপ্রায় অনুরাগ-বিবর্ধনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই সফলকাম হন নাই। তিনি বলিতেন, 'আমি আমার অমরত্তা সম্বন্ধে কোন কথা শুনিতে চাই না,

কারণ ঐ সব আলোচনা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। আমাদের ঐহিক জীবনই দুঃখের ভারে এতদূর প্রপীড়িত যে তাহার উপরে আবার দুঃখবহুল অনন্ত জীবন কল্পনা করা প্রীতিপদ নহে। খ্রীষ্ট মানব জাতির উদ্ধারমানসে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন স্বীকার করি, কিন্তু শুধু খ্রীষ্টান হইলেও পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। যে সৎপথাবলম্বী সে খ্রীষ্টধর্মে অবিশ্বাসী হইলেও স্বর্গে যাইবে। আর যে অসৎপথাবলম্বী সে খ্রীষ্টান হইলেও নিরয়গামী হইবে। ঈশ্বর মঙ্গলময় তিনি সব সময়ে স্বীকার করিতেন না। টেনিসন বলিয়াছেন (In Mem., 54)—

—Somehow good
Will be the final goal of ill.

কোন-না-কোন প্রকারে অমঙ্গলের পরিণাম মঙ্গল, ইহা তিনি মানিতেন না, এমন নহে; তিনি বলিতেন, যে ঈশ্বর অমঙ্গলের সহকারিতা ব্যতীত মঙ্গলোৎপাদনে সমর্থ নহেন, তিনি সর্বশক্তিমান্ নহেন। তাঁহার Cain নামক নাটকে Lucifer এবং Cain-এর কথোপকথন-প্রসঙ্গে Cain ঐরূপ কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—'Why is evil, He being good?' খ্রীষ্টানেরা অবশ্য এই অমঙ্গলের অস্তিত্ব বুঝাইতে গিয়া ঈশ্বরের কার্যের প্রতিরোধকারী শয়তান নামক এক প্রতিকূল শক্তিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তাহাতে ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তার হানি হইয়াছে। পাপের আদি-কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া বায়রন এক এক সময়ে ঈশ্বরের উপরেই সমস্ত দোষ আরোপ করিয়াছেন। অমরনাথ যেমন বলিতেন—"প্রভো! আপনার কাছে একটা নিবেদন আছে। এ দেহ কলঙ্কিত করাইল কে? তুমি না আমি? আমি যে অসৎ, অসার, দোষ আমার না তোমার? আমার এ মনিহারীর দোকান সাজাইল কে?" সেইরূপ বায়রনও সময়ে সময়ে মনে মনে জিজ্ঞাসা করিতেন—'আমি পাপ করিয়াছি স্বীকার করি, কিন্তু আমাকে এ পাপের প্রবৃত্তি দিল কে?' যিনি কর্মফল মানেন না, অথবা শয়তানের শক্তিমত্তায় বিশ্বাসবান্ নহেন, তাঁহাকে কাজেই বলিতে হয়, ঈশ্বরই ইহার মূল। ঈশ্বর কর্তৃক যে প্রবৃত্তি মানবের অন্তঃকরণে নিহিত হইয়াছে, তাহার অলঙ্ঘনীয় অনুশাসনে যে পাপের অনুষ্ঠান হয়, তাহার জন্য দায়ী ঈশ্বর, মানুষ নহে। সুতরাং সেজন্য মানুষ শাস্তিভোগ করিবে কেন? ওমর খৈয়াম বলেন

"He binds us fast in nature's cogent chain,
And yet bids us our natures to restrain ;
These counter precepts how can we obey ?
Hold the jar slant, but yet the wine retain."

এই তত্ত্ব অনেকের মনেই উদিত হইয়াছে। Lord Brooke-এর Mustaphaতে আছে—

"Oh wearisome condition of humanity !
Born under one law, to another bound,
Vanity-begot, and yet forbidden vanity,
Created sick, commanded to be sound ;
What meaneth nature by these diverse laws ?"

বায়রনও এই ভাবের ভাবুক ছিলেন, সুতরাং ধর্ম সম্বন্ধেও তাঁহার বৈপ্লবিকতা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। যাঁহার ধর্মবিশ্বাস এইরূপ তিনি যে স্বভাবতঃ বিবাদপ্রিয় হইবেন তাহাতে আশ্চর্য কিছুই নাই। যিনি শৈশবে পিতৃহীন ও মাতৃস্নেহে বঞ্চিত, সমাজ কর্তৃক উৎপীড়িত, সমালোচক-মণ্ডলী কর্তৃক লাঞ্ছিত, দেশ হইতে বহিষ্কৃত ; যিনি পদে পদে সমাজের ধর্মের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া পরে অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়াছেন ; যিনি অতৃপ্ত পিপাসায় শান্তিকামনায় ভবঘুরের ন্যায় দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন—তাঁহার বিবাদপ্রিয়তা কিছু বিস্ময়ের বিষয় নহে। সংসারের সুখে, বিলাসের চটকে, প্রকৃতির সৌন্দর্যে ডুবিয়া তিনি প্রাণের অন্তর্নিহিত বেদনারাশি ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেন—কিন্তু বৃথা চেষ্টা ! কলনাদিনী বেগবতী রাইনের তীরশোভী অটবীরাজিতে, জেনেভা হ্রদের শান্তশীতল মধুর বক্ষে, তুঙ্গ শৃঙ্গ আল্পস্ পর্বতের বিজন শিখরে—কোথাও তিনি নিজকে ভুলিতে পারেন নাই*। আর যতক্ষণ আত্মবিস্মৃতি না ঘটে, যতক্ষণ কামনার বিসর্জন না হয়, ততক্ষণ শান্তির আশা বৃথা !

* এই বিষয়ে রুসোর কথা স্বভাবতঃই মনে পড়ে। যদিও রুসো এবং বায়রনের চিত্ত দেশকাল ব্যবধান সত্ত্বেও, অনেকটা একই উপাদানে গঠিত ছিল, তথাপি এ বিষয়ে উভয়ের তীব্র পার্থক্য লক্ষিত হয়। আল্পস্ পর্বত দেখিয়া রুসো বলিতেছেন—"Our meditations gain a character of sublimity and grandeur proportionate to the objects around us.

"বিনু সন্তোষ ন কাম ন সাহীঁ,
কাম আছত সুখ স্বপনে হু নাহীঁ।"

সন্তোষ ব্যতীত কামনা ধ্বংস হয় না, আর কামনা নষ্ট না হইলে স্বপ্নেও সুখলাভের আশা নাই। বায়রনেরও তাই হইয়াছিল। তাঁহার ভাগ্যে শান্তি-সুখ লেখা ছিল না।

তিনি বলিতেন, 'At Tiber I long for Rome, at Rome I long for Tiber'—এই মানসিক চঞ্চলতা, যাহা তাঁহার অশান্তির প্রধান কারণ, তাঁহার বর্ণনায়ও লক্ষিত হয়। "বায়রনের বর্ণনায় শান্তি নাই, কেবল পরিবর্তন হইতেছে, অসংখ্য পরিবর্তন, এটা ছেড়ে ওটা, ওটা ছেড়ে সেটা, যেন তৃপ্তি হইতেছে না, যেন একটু চটা-চটা ভাবের উদয় হইতেছে,—যেন যাহার অন্বেষণে স্বভাবের শোভা দেখিতে আসিয়াছি সে সুখটুকু পাইতেছি না,—কেবল কৌতূহলতৃষ্ণায় কাতর হইয়া যাহা কিছু সুন্দর দেখিতেছি, দেখিতে যাইতেছি, দেখিতেছি, তৃপ্তি হইতেছে, কিন্তু সেই তৃপ্তি বেশীক্ষণ থাকিতেছে না"*। তাঁহার প্রেম এই নৈসর্গিক চঞ্চলতা হইতে মুক্ত ছিল না। যখন নবম বর্ষ বয়সে Mary Duff-এর প্রতি তাঁহার প্রথম প্রণয়-সঞ্চার হইয়াছিল, সেইদিন হইতে আরম্ভ করিয়া La Guiccioli-র প্রতি তাঁহার শেষ

It seems as if being lifted above all the haunts of men, we had left every low earthly feeling behind, and that, as we approach the eternal regions, the Soul imbibes something of their eternal purity. We are grave without being melancholy, tranquil without being indolent, content merely to exist and to think; our passions lose their painful violence, and leave only a gentle emotion in our breast.—In short, there is something magical in these mountainous prospects which ravish both senses and mind; one forgets everything, one forgets one's self". আর সেই পর্বত দেখিয়া বায়রন বলিতেছেন—"Neither the music of the shepherd, the crashing of the avalanche, the torrent, the glacier, the forest, nor the cloud, have for one moment lightened the weight upon my heart, nor enabled me to lose my wretched identity in the majesty and the power and the glory around, above, and beneath me."

* মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—"বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি।"

প্রণয়োদয় পর্যন্ত তিনি যে কত রমণীর প্রেমে পতিত হইয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। প্লেটো প্রেমের যে অত্যুজ্জ্বল রমণীয় আদর্শ অঙ্কিত করিয়াছিলেন, ভবভূতি যে স্বর্গীয় প্রেমের মহনীয় গুণকীর্তন করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন—সেই 'অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োঃ', সর্বাবস্থায় অবিচল, গভীর, অতল-স্পর্শ প্রেম বায়রনের ছিল না। কুমারী বিয়াট্রিসের প্রতি দান্তের (Dante) প্রেম, কুমারী ক্লাটিল্ডের প্রতি কোম্তের (Comte) প্রেম, অথবা সোফিয়া কিংবা জুলিয়ার প্রতি নোভেলিসের (Novalis) প্রেম বায়রনের ছিল না। যে প্রেমের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বৈষ্ণব কবি বসন্ত রায় গাহিয়াছিলেন—

"তুমি মোর ত্রিজগৎ, বিভব, বিহার,
পরাণ-পুতলি মোর, হিয়ে মণিহার"—

সে প্রেম বায়রনের ছিল না। বায়রনের প্রেম কতকটা 'তারামৈত্রক' অথবা চক্ষুরাগ, কতকটা আসঙ্গলিপ্সা, কতকটা অবসাদময় শূন্য হৃদয়ের লক্ষ্যশূন্য পিপাসা মাত্র। কিন্তু ইহাতে তীব্রতা ছিল, আবেগ ছিল, উচ্ছ্বাস ছিল। তাই তাঁহাকে আজীবন নৈরাশ্যের বৃশ্চিক-দংশন ভোগ করিতে হইয়াছে।

ব্রাউনিং

এক

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডের কাব্য-গগনে টেনিসন এবং ব্রাউনিং ভাস্বর নক্ষত্র। বর্তমান সময়ে টেনিসনের নাম সর্বজনবিদিত--দেশে বিদেশে তাঁহার প্রভূত সম্মান; কিন্তু ব্রাউনিংএর পাঠক-সংখ্যা নিতান্ত বিরল। ইহার কারণ নির্দেশ করা সুকঠিন নহে। টেনিসনের রচনাবলী প্রাঞ্জল, পাঠমাত্রই অর্থপ্রতীতি হয়, ভাবগাম্ভীর্য সত্ত্বেও মস্তিষ্কের ব্যায়াম অনাবশ্যক। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অতুলনীয় শব্দগ্রন্থণপটুতা, সুতীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তি প্রভৃতি বহুগুণে মণ্ডিত বলিয়া তাঁহার কবিতা পাঠক-সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। কিন্তু ব্রাউনিংএর ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। ব্রাউনিং-এর রচনা কোমল-কান্ত-পদাবলী নহে, ব্রাউনিং লোকরঞ্জন অপেক্ষা লোক-শিক্ষাকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার লেখার সর্বত্র পদ-বিন্যাসের লালিত্য দেখিতে পাই না, অনেক স্থলেই তাঁহার কবিতা কর্কশ, কঠোর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এই কর্কশতার অন্তরালে যে অলোক-সামান্য ধীশক্তি এবং অনির্বচনীয় সৌন্দর্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহার সন্ধান না পাইয়া অনেক পাঠক ব্রাউনিং-এর প্রতি বীতরাগ হইয়া পড়েন। টীকাকার মল্লিনাথ কিরাতার্জ্জুনীয়ের টীকারম্ভে লিখিয়া গিয়াছেন যে—

> "নারিকেলফলসম্মিতং বচো ভারবেঃ সপদি তদ্ বিভজ্যতে।
> স্বাদয়ন্তু রসগর্ভনির্ভরং সারমস্য রসিকা যথেপ্সিতম্ ॥

ব্রাউনিং-এর কবিতাও ভারবির রচনার মত কঠোর আবরণে আচ্ছাদিত রসগর্ভ নারিকেল ফলের সহিত উপমিত হইতে পারে। তাহার রসাস্বাদন অসহিষ্ণু পাঠকের ভাগ্যে ঘটিবার নহে। ব্রাউনিং-এর মহত্ত্ব কোথায়, তাঁহার জীবনের এবং কবিতার গভীর উদ্দেশ্য কোন্ স্থানে নিহিত, তিনি মানব-জাতির নিকট কোন্ মহান্ সত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন,—এই কয়েকটি কথা যথাসম্ভব সংক্ষেপে আলোচনা করিব। এইজন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

বিখ্যাত ফরাসী সমালোচক Sainte Beauve বলিয়াছেন যে ঈশ্বর প্রকৃতি, প্রতিভা, ললিতকলা, প্রেম, মানবজীবন—প্রধানত এই ছয়টি মৌলিক তত্ত্ব সর্ববিধ কবিতার মূলীভূত উপাদান। আমরা সমালোচনা-প্রসঙ্গে এই কয়েকটি কথা স্মরণ রাখিব এবং আলোচ্য কবির কাব্যে এই তত্ত্বগুলি কি ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ ঈশ্বরতত্ত্বের কথা—মানবের সহিত, জগতের সহিত ভগবান্ কোন সম্বন্ধে সম্বদ্ধ এবং কবির হৃদয়-ফলকে ভগবানের মূর্তি কিভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে ইহা দেখিতে হইবে। জড়বিজ্ঞানবাদী কঠোর বৈজ্ঞানিক বলেন Law is God, নিয়মই ঈশ্বর। ক্ষুদ্রতম অণু-পরমাণু হইতে বিশাল নক্ষত্রপিণ্ড পর্যন্ত জগতের কুত্রাপি নিয়মশৃঙ্খলার ব্যবচ্ছেদ নাই। যেমন বহির্জগতে তেমনি অন্তর্জগতে,—সর্বত্রই নিয়মের সমান শাসন। নিয়মের প্রভাব হইতে অব্যাহতি পায় এমন বস্তু জগতে নাই। নিয়ম সর্বব্যাপী, সর্বান্তবর্তী। সুতরাং নিয়মই ঈশ্বর। টেনিসন বিজ্ঞানের ভক্ত উপাসক ছিলেন, কিন্তু তিনি বৈজ্ঞানিকের হৃদয়শূন্য উক্তি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন—God is Law, say the wise, জ্ঞানীর মতে ঈশ্বরই নিয়মস্বরূপ, নিয়ম ঈশ্বর নহে। নিয়মস্বরূপ ঈশ্বরের সৃষ্ট জগতে নিয়মের অধিষ্ঠান স্বাভাবিক। তিনি নিয়মের মহত্ত্ব, নিয়মের শক্তিমত্তা উপলব্ধি করিতেন, তাই তাঁহার কাব্যের সর্বত্র নিয়মের মহিমাকীর্তন শুনিতে পাই। তিনি বলেন—"Nothing is that errs from Law"। তিনি নিয়মেই ভগবানের সত্তা প্রকাশিত দেখিতে পান। কিন্তু ব্রাউনিং ইহাতে সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহার হৃদয় শুষ্ক নিয়মের দিকে অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হয় না, তিনি ভগবানের সহিত এত দূর-দূর সম্পর্ক ভালবাসেন না। নিয়মের মধ্যস্থতায় ভগবানকে উপলব্ধি করিতে হইবে, ইহা তিনি বুঝিতে পারেন না। ভগবানের সহিত টেনিসনের সম্পর্ক কতকটা বুদ্ধি-জাত, বুদ্ধি-সংশ্লিষ্ট, ব্রাউনিং-এর সম্পর্ক কতকটা হৃদয়ের সম্পর্ক, প্রাণের আকর্ষণ। মানবের অনন্ত চিত্তবেদনা এবং উচ্চ আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যে একটি মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য আছে, ব্রাউনিং-এর কল্পনা তাহার মধ্য হইতে আপনার জীবনোপযোগী রস আহরণ করে। এই শোভাময়ী প্রকৃতির অনন্ত সুষমার মধ্যে, মানব হৃদয়ের চির-সঞ্চিত প্রেমপ্রবাহের মধ্যে, ব্রাউনিং ভগবানের আবির্ভাব মনে অনুভব

করেন। নব বসন্তের করস্পর্শে সমগ্র প্রকৃতি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে, নবোন্মেষিত সৌন্দর্যের হিল্লোলে জগৎ স্পন্দিত হইয়াছে, কোকিল-কূজন, কুসুম-সৌরভ এবং দক্ষিণ পবনে চতুর্দিকে একটা বিচিত্র আনন্দের আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে—ব্রাউনিং বুঝিলেন ভগবান বিশ্ব-বিমোহন বেশে জগৎ সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন।

"The Lark
Soars up and up, shivering for very joy ;
Afar the ocean sleeps ; white fishing gulls
Flit where the strand is purple with its tribe
Of nested limpets ; savage creatures seek
Their loves in wood and plain—and God renews
His ancient rapture !"

সর্বব্যাপী শক্তি, ইচ্ছা এবং প্রেমের প্রকাশ ব্যতীত প্রাকৃতিক নিয়মের মূল্য নাই। শুধু প্রাকৃতিক নিয়ম তো জড়-শক্তির লীলা মাত্র, তাহার সঙ্গে মানব হৃদয়ের সম্পর্ক কি ? ভারতীয় বৈষ্ণব কবির ন্যায় ব্রাউনিং প্রাণে প্রাণে অন্তরে অন্তরে ভগবানের মধুর রূপ ধ্যান করিতে ভালবাসেন। তিনি ভাবেন মেঘবিনির্মুক্ত আকাশে দ্বিপ্রহর কালে সূর্য যেমন উজ্জল ভাবে প্রকাশ পায়, আমাদের চিত্তগগনে ভগবানের প্রকাশও সেইরূপ, কোনও বাধা নাই, কোনও অন্তরায় নাই, বাসনা-মেঘের ছায়া মাত্র নাই।

"He glows above
With scarce an intervention, presses close
And palpitatingly, His soul over ours."

টেনিসনের ন্যায় ব্রাউনিংও মঙ্গলবাদী। টেনিসন বলিয়াছেন, "every winter change to spring," ব্রাউনিংও প্রকারান্তরে ঐ কথাই বলিয়াছেন—তবে উভয়ে প্রভেদ আছে। টেনিসন মানবজাতির অনন্ত উন্নতিতে বিশ্বাসবান্, ব্রাউনিং-এর কল্পনায় মানব-জাতির কথা তত বেশী স্থান পায় না। তিনি মানবের ব্যক্তিগত জীবনের এবং ভবিষ্যতের কথা লইয়াই ব্যস্ত। ব্রাউনিং মনে করেন জ্ঞান, বুদ্ধি এবং রাজ-নৈতিক অধিকারের সীমা-বিস্তারের দ্বারা কখনও মানুষের চিরন্তন উন্নতি

সাধিত হইতে পারে না। প্রকৃত উন্নতি মানবের অনুভব শক্তি, আশা আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ এবং দুঃখ-সহিষ্ণুতার উপর নির্ভর করে। এ সংসারে মানুষ মাত্রই অতৃপ্ত, রাজ্যেশ্বর হইতে পথের কাঙাল পর্যন্ত সকলেই নিজ নিজ অবস্থায় অসন্তুষ্ট, এ সীমাবদ্ধ সংসারের ক্ষুদ্র সুখে তাহার অনন্ত পিপাসা তৃপ্ত হয় না, তাহার হৃদয়ের অনন্ত সৌন্দর্য-তৃষ্ণা পার্থিব জগতের সর্ব সৌন্দর্য ভোগ করিয়াও অপূর্ণ থাকিয়া যায়, এ সংসারের সুখ, সৌন্দর্য, প্রেম তাহাকে ভোগ হইতে ভোগান্তরে টানিয়া লইয়া যায়, কিন্তু কখনই তৃপ্তি দান করে না। এইরূপে সে ক্রমশঃ বুঝিতে পারে যে 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।' এইরূপে সংসারের অপূর্ণতাই তাহাকে পূর্ণস্বরূপ ভগবানের নিত্যানন্দ, অনন্ত সৌন্দর্য, অতুল প্রেমের মাহাত্ম্য বুঝাইয়া তাহার অধিকারী করিয়া তোলে।

শুধু সংসারের ভোগ-বৈচিত্র্যে যদি তাহার প্রাণ তৃপ্তিলাভ করিত তাহা হইলে তাহার হৃদয়ের অন্তরাভিমুখী গতি কোথায় থাকিত? আবদ্ধ জলের ন্যায় তাহার আত্মা দূষিত হইয়া পড়িত। এই অতৃপ্তিতেই মানুষের মহত্ত্ব—সংসারের চরম ঐশ্বর্যও আমাদের আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা সাধন করিতে পারে না, ইহাতেই আমাদের হৃদয়ের বিশালতা।

> "Progress, man's distinctive mark alone,
> Not God's and not the beasts', God is, they are,
> Man partly is, and wholly hopes to be."

আমাদের জীবনের মধ্যদিয়া, শত শত নৈরাশ্য-পরম্পরা ভেদ করিয়া আমরা উচ্চতম আদর্শের সন্নিহিত হই। সুতরাং জীবনে নৈরাশ্য, অকৃত-কার্যতা, দুঃখ-কষ্টের প্রয়োজনীয়তা আছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না বরং এই হিসাবে দেখিতে গেলে সুখ অপেক্ষা দুঃখের, কৃতকার্যতা অপেক্ষা অকৃতকার্যতার উপযোগিতা অধিক।

যেমন ঈশ্বর সম্বন্ধে, প্রকৃতি সম্বন্ধেও ব্রাউনিং-এর দৃষ্টি তদ্রূপ। এই সুনীল আকাশ, এই শ্যামলা ধরণী তাঁহার বড় প্রিয়, কারণ ইহাতে তিনি ভগবানের শক্তি এবং প্রেমের বিকাশ দেখিতে পান। প্রকৃতি আমাদিগকে আবদ্ধ করে না। আমাদিগকে ভগবানের প্রেম এবং ঐশ্বর্য অঙ্গুলি-সঙ্কেতে দেখাইয়া দেয়—from Nature upto Nature's God. যে হতভাগ্য কেবল জগৎকে ভালবাসিয়াছে, এই সৌন্দর্যপূর্ণ, বিস্ময়কর, আনন্দময় বিশাল

প্রকৃতিকে ভালবাসিয়াও প্রকৃতির প্রেমময় অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় নাই, সে অভিশপ্ত জীব। তাহার উপর ভগবানের অভিশাপ বর্ষিত হইয়াছে।

Thou art shut
Out of the heaven of spirit ; glut
Thy sense upon the world.

ইহা অপেক্ষা কঠোর অভিশাপ আর কি হইতে পারে ? কারণ আমরা এই জগৎকে দেখিয়া যদি জগদতীতকে লাভ করিবার চেষ্টা না করি, যদি এই অসীম জগতেই আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষার পর্যবসান হয়, তবে আমাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

প্রতিভা সম্বন্ধেও ব্রাউনিং-এর ধারণা এই যে প্রকৃত প্রতিভা আমাদের সুপ্ত মনোবৃত্তিকে জাগাইয়া তোলে, আমরা প্রাণে প্রাণে যেন একটা অনির্বচনীয় অভাব অনুভব করি, কিন্তু সে অভাবের মোচন অথবা সে উদ্বোধিত আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা সংকীর্ণ জীবনে ঘটিয়া উঠে না। পাঠকের মনে এই উদার ব্যাকুলতার সৃষ্টি প্রকৃত প্রতিভাবানের কাজ।

কলাবিদ্যা সম্বন্ধে ব্রাউনিং যে সত্য প্রচার করিয়াছেন তাহারও অন্তর্দেশে আমরা এই মহান তত্ত্বটি উপলব্ধি করি। ললিত কলার প্রকৃত মহত্ত্বই এই যে ইহাতে আমাদের অন্তঃকরণে এমন কতকগুলি আকাঙ্ক্ষার ও আশার উদ্রেক করে যাহা পৃথিবীতে কখনও তৃপ্তি লাভ করে না, বরং ইহাতে আরও কতকগুলি নূতন নূতন বাসনার সৃষ্টি করে। এইরূপে আকাঙ্ক্ষা হইতে আকাঙ্ক্ষান্তরে উন্নীত হইতে হইতে ক্রমশঃ আমরা ভগবানের সিংহাসন-সান্নিধ্যে উপস্থিত হই। যে ভাস্কর, চিত্রকর অথবা গায়ক নিজের খোদিত মূর্তিতে, অঙ্কিত চিত্রে কিংবা গীত সঙ্গীতে আপনার মনোমত আদর্শ প্রতি-ফলিত করিতে পারিয়াছেন, যাঁহার শিল্পকার্যে লেশমাত্রও অসম্পূর্ণতা দৃষ্ট হয় না, তিনি কলাবিদ্যার পূর্ণ উদ্দেশ্য সংসাধনে অসমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষার অবসান হইয়াছে ; সুতরাং কলাবিদ্যা অনুশীলনের দ্বারা তিনি লাভবান হইতে পারেন নাই। "Andrea del Sarto" নামক কবিতাতে ব্রাউনিং এই তত্ত্বটি পরিস্ফুট রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। Andrea নির্দোষ চিত্রকর (faultless painter), তাঁহার চিত্রে সামান্য একটি রেখা

পর্যন্ত অযথা বিন্যস্ত হয় না। তিনি মনোমধ্যে সৌন্দর্যের যে রমণীয় আদর্শ কল্পনা করেন, তুলিকাসংযোগে তাহা পূর্ণভাবে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন—তাঁহার চিত্র সর্বতোভাবে তাঁহার আদর্শ অনুযায়ী হয়, সর্বত্রই অনিন্দ্যসুন্দর; কোন স্থানে তিলমাত্র ভ্রম অথবা অনুচিত বর্ণবিন্যাস দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং তাঁহার চিত্রে দর্শকের নয়ন তৃপ্তি লাভ করে বটে, কিন্তু হৃদয়ে একটা অনির্দিষ্টের দিকে আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করে না, তদপেক্ষা উচ্চতর এবং অধিকতর মনোহর সৌন্দর্যের ছবি মনোমধ্যে স্বপ্নবৎ জাগাইয়া তোলে না। তাঁহার চিত্র সর্বাঙ্গসুন্দর, রমণীয়তার চরমোৎকর্ষ—কাজেই ইহাতে চিত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হয় না।

A man's reach should exceed his grasp,
Or what is Heaven for? All is silver grey,
Placid and perfect with my art—the worse."

কিন্তু যুবক Raphael-এর চিত্রকলা তত নির্দোষ নহে, মাঝে মাঝে ভ্রম প্রমাদও যথেষ্ট আছে। কিন্তু তথাপি Andrea রাফেলকে উচ্চতর চিত্রকর আখ্যা প্রদান করিত এবং এমন কি তাঁহাকে চিত্রগুরু বলিয়া ভক্তি করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। তাহার কারণ এই—

"the true artist is ever sent through and beyond his art unsatisfied to God, the fount of light and beauty."*

'Abt Vogler' ব্রাউনিং-এর আর একটি মনোহর কবিতা। এই প্রাচীন গীতিবিদ্যাবিশারদ বাদক নিজের ভগ্ন বাদ্যযন্ত্রের উপর যে বিলাপসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন তাহা চিরদিন প্রাণে গাঁথিয়া রাখিবার যোগ্য। ইহাতে ব্রাউনিং-এর কলাসম্বন্ধীয় মতামত ব্যক্ত হইয়াছে। Vogler একজন স্বভাবসিদ্ধ গায়ক। তাঁহার সঙ্গীতের এরূপ মোহিনীশক্তি ছিল যে শোনামাত্রই মনে হইত যেন স্বর্গরাজ্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। সঙ্গীতের মোহমন্ত্রে আকৃষ্ট হইয়া কত কত দেবযোনি তাঁহার বশীভূত হইত এবং তাঁহার সমক্ষে নয়নাভিরাম অথচ ক্ষণস্থায়ী প্রাসাদ রচনা করিত। প্রাসাদের ভিত্তি পাতাল পর্যন্ত প্রসৃত, স্বচ্ছ প্রাচীরমালা গগনস্পর্শিনী, চূড়াদেশে জলন্ত উল্কাপিণ্ড-সকল শোভা পাইত। এই মায়ামন্ত্রগঠিত প্রাসাদে পৃথিবী যেমন স্বর্গস্পর্শ-

* See Dowden's "Studies in literature.' P. 223.

কামনায় উৰ্ধ্বোত্থিতা, তেমনি স্বৰ্গও পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষায় অবনত। এখানে অতীত কালের মৃত মহাত্মাগণ উপস্থিত হইতেন, ভবিষ্যতের অজাত প্রাণি-মণ্ডলী জন্মগ্রহণের পূর্বেই কল্পনাবলে ভালরূপে আবির্ভূত হইতেন; নিকট এবং দূরে সর্বত্রই নবজীবন এবং নবীন মহিমার সমাবেশ দেখা যাইত, অনাদি অতীত এবং অনন্ত ভবিষ্যৎ বর্তমানের সহিত একত্র মিলিত হইত। কিন্তু এখন এ প্রাসাদ চূর্ণীকৃত হইয়াছে—সঙ্গীতোপশমের সঙ্গে সঙ্গে এ মায়াপুরী অন্তর্হিত হইয়াছে। Vogler প্রাণে প্রাণে ইহার অভাব অনুভব করিতেন, কারণ ইহা আর ফিরিবে না।

তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত রহিয়া গেল— ক্ষণিকের জন্য তাঁহার হৃদয়ে বিষাদ এবং শূন্যতার ছায়া পরিলক্ষিত হইল। কিন্তু সে কতক্ষণ? মুহূর্ত মধ্যেই তাঁহার অপূর্ণ আশা পূর্ণতার জন্য পূর্ণস্বরূপ ভগবানের দিকে প্রধাবিত হইল। Vogler সান্ত্বনা লাভ করিলেন, উদ্যত করযুগলে ঈশ্বরের নিকট ব্যাকুলভাবে আপনার হৃদয়ের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন—"হে দেব, হে অমর নামময় মহাপুরুষ, আমি তোমাকে ছাড়িয়া এখন আর কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব? নির্মাতাও তুমি, স্রষ্টাও তুমি—যে প্রাসাদ মানবের কর-সাহায্যে গঠিত হয় না সে অদৃশ্য প্রাসাদের রচয়িতাও তুমিই। তোমা হইতে বিকার অথবা পরিবর্তনের আশঙ্কা নাই, কারণ তুমি সমভাবাপন্ন। যে হৃদয় তুমি প্রসারিত করিয়াছ সে হৃদয় তুমিই পূর্ণ করিবে—যে আকাঙ্ক্ষা তুমি উদ্বোধিত করিয়াছ সে আকাঙ্ক্ষা তুমিই সফল করিবে—আমি তাহাতে সংশয় করি না।

"একটি মঙ্গলও নষ্ট হইবে না। যাহা ছিল তাহা পূর্ববৎ চিরদিনই বিদ্যমান থাকিবে। অমঙ্গল—সে ত শূন্য পদার্থ, মিথ্যা বস্তু, নিঃশব্দ অভাব মাত্র। যাহা পূর্বে মঙ্গল ছিল তাহা পরেও মঙ্গলই থাকিবে, অমঙ্গল সত্ত্বেও —অমঙ্গল সহিতও—মাঙ্গল্যশক্তি কখনই ধ্বংস হয় না, বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পৃথিবীতে যাহা খণ্ডতাপন্ন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত, স্বর্গে তাহা পূর্ণরূপে বিরাজমান।

"আমরা চিরদিন যাহা চাহিয়া আসিতেছি, যাহার প্রতি আমাদের একান্ত আশা নিহিত, যে শুভ স্বপ্ন আমাদের নিশিদিনের মানস-সহচর, তাহাকে আমরা অবশ্যই প্রাপ্ত হইব—তাহা আছে এবং চিরদিনই থাকিবে—ছায়া নহে, সাদৃশ্য নহে, প্রকৃত বস্তু। যে সৌন্দর্য, মঙ্গল অথবা শক্তির মহাবাণী একবার

ধ্বনিত হইয়াছে, কুত্রাপি আর তাহার বিনাশ নাই। যখন অনন্ত কালের মধ্যে মুহূর্তের কল্পনা সমতা প্রাপ্ত হইবে, সেই মহাক্ষণে আবার সে অন্তর্হিত সৌন্দর্য, অদৃষ্ট মঙ্গল এবং সুপ্ত শক্তি প্রকাশমান হইবে।

"যে উচ্চ ভাব অত্যধিক উচ্চতার জন্য অপূর্ণ রহিয়াছে, যে বীরত্ব-কল্পনা ক্ষুদ্র সংসারের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে নাই, যে চিত্ত-বেদনা পৃথিবীর অন্তঃকরণ হইতে উঠিয়া আশ্রয় খুঁজিতে খুঁজিতে নিরালম্ব ভাবে আকাশে বিলীন হইয়াছে—সে সমস্তই প্রেমিক অথবা কবির হৃদয়োত্থিত ঈশ্বরোদ্দিষ্ট সঙ্গীতলহরী। যদি উহা একবার তাঁহার শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে তাহা হইলেই যথেষ্ট, উহা শীঘ্রই আমরা শুনিতে পাইব।"

প্রেম সম্বন্ধেও ব্রাউনিং-এর শিক্ষা কিছু স্বতন্ত্রভাবাপন্ন। যে-কোন প্রকার গভীর আবেগ আমাদের চিত্তের উন্নতিকর, ইহা ব্রাউনিং-এর বিশ্বাস। কারণ উহাতে আমাদের প্রাণে অনন্তাভিমুখী অনন্ত কালস্থায়িনী গতির সৃষ্টি হয় এবং এই গতির দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সন্নিহিত হইতে পারি। এই স্থলেও টেনিসন এবং ব্রাউনিং-এর মধ্যে কিছু প্রভেদ লক্ষিত হয়। উভয় কবিই মানবের নানাবিধ প্রলোভনের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু উভয়ে কি সুদূর ব্যবধান! টেনিসন মনে করেন, কর্তব্য-কর্ম অবহেলা করিয়া অথবা বিবেকের বাণী অগ্রাহ্য করিয়া প্রেমপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা মানবের প্রধান প্রলোভন। কিন্তু ব্রাউনিং মনে করেন সতর্ক সাংসারিকতা—লোকাপবাদের ভয়, গভীর আলস্য অথবা হৃদয়ের দুর্বলতার খাতিরে জীবনের প্রকৃত উন্নতিদায়ক এবং মহিমাব্যঞ্জক প্রেমপ্রবৃত্তির পরিচালনা না করা মানুষের অধিকতর প্রলোভন। "Youth and Art' নামক কবিতায় ব্রাউনিং দেখাইয়াছেন যে, প্রেমের অভাবে জীবন শুষ্ক হইয়া যায়। একটি ভাস্কর বালক এবং সঙ্গীত-বালিকার মধ্যে অল্পে অল্পে প্রণয় সঞ্চার হইতেছিল। কিন্তু সে ভাব অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। উভয়ের মনে অদম্য বৈষয়িক স্পৃহা ছিল, সতর্ক সাংসারিকতার দ্বারা উভয়ের জীবন পরিচালিত হইতে লাগিল। সুতরাং যে স্ফুলিঙ্গ এতদিন অন্তরে অন্তরে একটু একটু প্রজ্বলিত হইতেছিল বিষয়ানিলে তাহা একেবারে নির্বাপিত হইয়া গেল। উভয়েই সংসারে প্রভূত প্রতিপত্তি এবং কৃতকার্যতা লাভ করিলেন, কিন্তু শেষে দেখিলেন কেহই সুখী হইতে পারেন নাই—

"Each life's unfulfilled, you see,
It hangs still patchy and scrappy,
We have not sighed deep, laughed free,
Starved, feasted, despaired,—been happy."

The Statue and the Bust-এও এই সত্যই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ডিউক এবং মহিলার হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি আসক্তি জন্মিয়াছিল। এই মহিলা পরিণীতা রমণী—তাঁহার স্বামী এই গূঢ় আসক্তির বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে প্রাসাদকক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। মহিলা বাতায়ন-সন্নিধানে উপবেশন করিতেন এবং স্বীয় প্রণয়ীর দৃষ্টিলাভ করিবার জন্য ব্যাকুলভাবে তাঁহার প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। ডিউক প্রতিদিন যথাসময়ে অশ্বারোহণে তলবর্তী পথ দিয়া বাতায়নের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া গমনাগমন করিতেন। এইরূপে কতকদিন অতিবাহিত হইল। পরে উভয়েই সংকল্প করিলেন এক সঙ্গে পলায়ন করিবেন—কিন্তু আগামী দিবসের জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে আর পলায়ন ঘটিয়া উঠিল না। প্রত্যহই পরদিন পলাইবেন এই আশায় উৎফুল্ল থাকেন, কিন্তু সে পরদিন আর আসিল না। এদিকে ক্রমেই তাঁহাদের প্রেমের নিবিড়তা শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল, তাঁহারা শূন্যগর্ভ আশা লইয়াই সন্তুষ্ট রহিলেন। এইভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটিয়া গেল—তাঁহারা উপলব্ধি করিলেন যে তাঁহাদের প্রেম অলীক স্বপ্ন মাত্র এবং এই স্বপ্নের মোহে তাঁহাদের সমস্ত যৌবন অতিবাহিত হইয়াছে।

"Gleam by gleam
The glory dropped from their youth and love,
And both perceived they had dreamed a dream."

যাহাতে এই স্বপ্নভঙ্গ না ঘটে এবং যাহাতে তাঁহাদের বিগলিত যৌবনের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ থাকে, এই উদ্দেশ্যে ডিউক নিজের পূর্ণ মূর্তি এবং মহিলা কেবল-মাত্র নিজের বদনমণ্ডল ভাস্কর দ্বারা গঠন করাইলেন। অতীত যৌবনে যে প্রকারে ডিউক এবং মহিলা পরস্পরের প্রতি আবদ্ধদৃষ্টি হইয়া অবস্থান করিতেন, পাষাণ মূর্তিতে অবিকল সেই ভাব রক্ষিত হইয়াছিল।

মানবজীবনের চিন্তাতেও টেনিসন এবং ব্রাউনিং-এ অনেক পার্থক্য। টেনিসনের মতে দীর্ঘকালস্থায়ী আত্মসংযমের দ্বারাই জীবনের নৈতিক

উদ্দেশ্য নিরূপিত হয়—প্রবৃত্তি এবং বাসনার বিরুদ্ধে বিবেকের পক্ষাবলম্বনে সংগ্রাম করিতে করিতে যখন আমরা জয় লাভ করি, তখন আমাদের জীবনের চরম মুহূর্ত। কিন্তু ব্রাউনিং মনে করেন তাহা নহে। তিনি বলেন, যখন অকস্মাৎ প্রেমের আলোকে বহু বৎসরের উপেক্ষিত ভাবসমূহ আমাদের মনে প্রকটিত হয়, অথবা যখন আমরা জীবন্ত আবেগজনিত অন্তর্দৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া জীবনের গতি-পরিবর্তনকারী কোন উদার উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কার্যে প্রবৃত্ত হই, তখনই আমাদের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত। কারণ, সমগ্র জীবনের শ্রেষ্ঠ ভাবসমূহ এবং মহান্ আদর্শ সকল উক্ত মুহূর্তে সূক্ষ্মভাবে নিহিত থাকে।

দুই

ব্রাউনিং-এর প্রতিভা এত বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক বিভাগেই তিনি এত অধিক পরিমাণে সূক্ষ্মদর্শিতা ও অভিনবত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন যে উহার জন্য অনেকে তাঁহাকে সেক্সপীয়রের অব্যবহিত নিম্নস্থানেই আসন প্রদান করেন। অবশ্য এ প্রশংসা কিয়দংশে অতিরঞ্জিত হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই যে ব্রাউনিং-এর নাটকীয় ক্ষমতা ইংরাজী সাহিত্যে প্রায় অতুলনীয় ছিল। তাঁহার বৈচিত্র্যপূর্ণ বিবিধ কবিতাবলী হইতে ইহাই প্রমাণিত হয়। গ্রন্থকারের ব্যক্তিত্ব-বিলোপ, চরিত্রাঙ্কনে নিপুণতা, মানবের অন্তরস্থ পরস্পর বিসংবাদী ভাব ও স্বার্থসমূহের ঘাতপ্রতিঘাত, একটি সামান্য ঘটনার সহযোগিতায় বৈদ্যুতিক আলোকের ন্যায় সমস্ত হৃদয়কন্দর প্রতিভাসিত করা—ইহাই প্রকৃত নাটকীয় প্রতিভা, ইহা ব্রাউনিং-এ যে পরিমাণে বিদ্যমান ছিল, উনবিংশ শতাব্দীর বিদেশী আর কোন লেখকে সে পরিমাণে ছিল না।

পূর্ববর্তী প্রবন্ধে প্রেম, ললিতকলা প্রভৃতি কয়েকটি কবিজনোচিত বিষয়ে ব্রাউনিং-এর সংস্কার ও অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে। এখানে আমরা তাঁহার আর দু'একটি কবিতা বিশ্লেষণ করিয়া আর দু'একটি বিষয়ের আলোচনা করিব। Paracelsus ব্রাউনিং-এর একখানি সর্বজনপঠিত কাব্যগ্রন্থ। ইহা তাঁহার

তরুণ বয়সে রচিত হইলেও ইহাতে তাঁহার প্রতিভার পূর্ণবিকাশ লক্ষিত হয়। অধ্যাপক Hugh Walker ইহাকে উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহের অন্যতম বলিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রশংসা অত্যুচিত হয় নাই। ইহার কল্পনার বিশালতা, ভাবগাম্ভীর্য এবং উচ্চ নৈতিক উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া হর্ণ ইহাকে গেটের ফাউস্টের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন*। এই কাব্যে জীবনের সুগভীর তত্ত্বসমূহ কি অসাধারণ শক্তিমত্তা ও শিল্প-নৈপুণ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। ইহাতে একদিকে তাঁহার মানবজীবন-সম্বন্ধীয় সূক্ষ্ম সমালোচনার শক্তি ও অন্যদিকে উন্নত কবি-জনোচিত কলাকোবিদত্ব প্রকটিত হইয়াছে। এই কবিতার প্রকৃত শিক্ষা এই যে মানবজীবনরূপ মহাসৌধনির্মাণে শক্তি ও সৌন্দর্য এবং জ্ঞান ও প্রেম উভয়েরই সমান উপযোগিতা আছে—ইহার একটিও পরিত্যায নহে, যে কোন একটিকে ত্যাগ করিলেই সমগ্র সৌধ বিনষ্ট হইবে। পারাসেলসাস জ্ঞানপিপাসু সাধক, তিনি জগৎ ও জীবনের অন্তর্নিহিত জটিল রহস্যনিচয় আবিষ্কার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর, শান্তি ও প্রেমের মোহ বিসর্জন দিয়া তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির পরিশোধে'র সন্ন্যাসীর ন্যায় তিনিও জ্ঞানোপার্জনের দৃপ্ত অহমিকায় অন্ধীভূত হইয়া জনসাধারণের সংস্রব পরিত্যাগ করিলেন এবং একাকী নিঃসহায় অবস্থায় মানবমণ্ডলীর সমবেত চেষ্টাসাধ্য মহাসত্য অনুসন্ধানে অগ্রসর হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন না —ফেস্টাস্ তাঁহাকে বার বার বুঝাইয়া দিলেও তাহার বোধগম্য হইল না—যে তিনি যে পুণ্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মহাব্রতে ব্রতী হইয়াছেন তাহার উদ্‌যাপনে ব্যক্তিগত চেষ্টা সমুদ্রে জলবিন্দুবৎ নগণ্য এবং নিষ্ফল সে সাধনায় সিদ্ধকাম হইতে হইলে যুগ হইতে যুগান্তর পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির অক্লান্ত গবেষণা আবশ্যক। তিনি বুঝিতে পারিলেন না এ মহাসাধনায় অসংহত চেষ্টাতে সিদ্ধিলাভ দুর্ঘট। তাঁহার উদ্দেশ্য খুব বিশাল ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা তাদৃশ মহৎ ছিল না। তিনি নিজের অপরিমেয় জ্ঞান-পিপাসা তৃপ্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু জানিতেন না যে হৃদয়ের পিপাসা যতদিন অতৃপ্ত থাকিবে ততদিন জগতের অতুল জ্ঞানসম্পত্তি লাভ করিলেও তিনি সুখী হইতে

* See Harne's A New spirit of the Age.

পারিবেন না। হইয়াছিলও তাহাই। যখন প্রেমিক কবি এপ্রিলের সঙ্গে কঠোর বৈজ্ঞানিক পারাসেল্‌সাসের সাক্ষাৎ হইল তখন এপ্রিলের কোমল, মনোমোহন, প্রেমময়, রক্তরাগরঞ্জিত জীবনপটের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার মোহমুগ্ধ নেত্রযুগল হইতে তন্দ্রার আবেশ ছুটিয়া গেল, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার উদ্দেশ্য সর্বাঙ্গসম্পন্ন নহে। যাহা দ্বারা মনুষ্যের মনুষ্যত্ব—সেই প্রেম, বিশ্বাস, আশা এবং আশঙ্কা তিনি বিসর্জন দিয়াছেন। তাঁহার জীবন ব্যর্থ হইয়াছে—তিনি অনুভব করিতেছেন—

> "Time flees, youth fades, life is an empty dream ;
> This is the echo of the Time."

মহাকালের এই দিগন্তনিনাদী প্রতিধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তাই শেষ মুহূর্তে সতৃষ্ণ নয়নে এপ্রিলের দিকে তাকাইয়া আবেগপূর্ণ কণ্ঠে তিনি কহিতে লাগিলেন—

> "Love me henceforth, Aprille, while I learn
> To love ; and merciful God, forgive us both !
> We walk at last from weary dreams ; but both
> Have slept in fairy land ; though dark and drear
> Appears the world before us, we no less
> Wake with our wrists and ankles jewelled still.
> I too have sought to know as thou to love—
> Excluding love as thou refusedst knowledge.
> Still thou hast beauty and I power. We wake :
> What penance canst devise for both of us ?"

এইরূপে জ্ঞানী প্রেমিকের নিকট এবং প্রেমিক জ্ঞানীর নিকট জীবনের মহাসত্য শিক্ষা করিলেন।

ব্রাউনিং-এর আর একটি কবিতা আছে James Lie's Wife। উহা কাব্য সাহিত্যে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ডাক্তার টডহান্টার লিখিয়াছেন যে 'mystery and melancholy of change' অর্থাৎ হৃদয়ের বিষাদময় পরি-বর্তনরহস্যই এই কবিতার উদ্দীপনা। সত্যও তাহাই। ইহাতে বাহ্য ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে একটি নারী-চরিত্রের আভ্যন্তরীণ ক্রমবিকাশ সুন্দররূপে প্রদর্শিত

হইয়াছে। একটি কোমলহৃদয়া রমণী জেমস লী নামক একজন তরল-প্রকৃতি যুবকের সহিত উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধা হইয়া ছিলেন এবং অবশ্য উভয়ের প্রেম উভয়ের উপরে সন্যস্ত ছিল। কিন্তু কালচক্র আবর্তনে নবপ্রেমের মোহময় ইন্দ্রজাল অপসৃত হইলে চপলমতি যুবকের হৃদয় ক্রমেই তাঁহার পত্নী হইতে দূরগামী হইতে লাগিল, পত্নীর ঐকান্তিক প্রেমাবলম্বন। এখন আর তাহার প্রেমতৃপ্ত অন্তঃকরণে মধুধার বর্ষণ করিত না, বরং উহা তাঁহার নিকট বিরক্তিজনক বলিয়াই বোধ হইত। একজন সংস্কৃত কবি বলিয়াছেন—

'অপাং হি তৃপ্তায ন বারিধারা
স্বাদুঃ সুগন্ধিঃ স্বদতে তুষারা।'

(নৈষধ ৩।৯৩)—

নিবৃত্ততৃষ্ণ তৃপ্তহৃদয় পুরুষের নিকট তুষারশীতল সুবাসিত বারিধারাও উপাদেয় বলিয়া মনে হয় না। যতক্ষণ তৃষ্ণা, ততক্ষণ মাধুর্য— তৃষ্ণা অপগত হইলে মাধুর্যও বিনষ্ট হইয়া যায়। অবশ্য প্রকৃত ভালবাসা সম্বন্ধে এ কথা প্রযুজ্য নহে, প্রকৃত ভালবাসার আদর্শ অনেক উন্নত, অনেক মহান, অনেক বিশাল। উহাতে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে সঞ্চরণশীল মধুকরের অযথা চটুলতা নাই, উহাতে বহুবেশধারী বহুরূপীর মুহূর্তে মুহূর্তে নব নব ভাবে রূপান্তর পরিগ্রহণ নাই—উহা "অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্বাবস্থাসু", উহা স্থির গম্ভীর শান্ত অচঞ্চল কালরূপ মহাসমুদ্রের সংক্ষুব্ধ বীচিমালা উহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু উহাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না—উহাকেই টেনিসন বলিয়াছেন 'whirlwind's heart of peace' এবং রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন জগৎধ্বনির মাঝে স্থির স্বর্ণকমলে ভুবনলক্ষ্মী প্রেমের বাস। প্রকৃত ভালবাসা, সৌন্দর্য অথবা প্রতিভার ন্যায়, 'নিত্য নব নবোন্মেষশালিনী'। কিন্তু প্রেমের এ উচ্চতম আদর্শ চণ্ডীদাস অথবা জ্ঞানদাসের এ উদার কল্পনা— যুবকের চঞ্চল অন্তঃকরণে স্থানলাভ করিতে পারে নাই। যতই দিবস অতীত হইতে লাগিল ততই তাঁহার হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত রসপ্রবাহ বিশুষ্ক হইতে লাগিল, তাঁহার অন্তঃকরণের সুধাময়ী প্রেমমন্দাকিনী উৎসমুখেই অবরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল, স্ফুটনোন্মুখ মন্দার-কুসুম কোরকাবস্থাতেই বিশীর্ণ হইতে লাগিল।

রোহিণীর সংস্পর্শে আসিয়া ভ্রমরের প্রতি—নিরাপরাধা, অনন্যনিষ্ঠা, বালিকা ভ্রমরের প্রতি গোবিন্দলালের হৃদয়ের যেরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, নির্দোষা অনন্যচারিণী প্রেমাকুলা পত্নীর প্রতি যুবক স্বামীরও সেইরূপ পরিবর্তন সংঘটিত হইল। কিন্তু ইহা বুঝিতে রমণীর অধিক বিলম্ব হইল না। বাতায়ন-সন্নিধানে, অগ্নিকুণ্ডে, দ্বারদেশে, সৈকতপুলিনে, গিরিশিখরে ও অন্যান্য স্থানে স্বামীর সহিত তাঁহার যে সাক্ষাৎকার ও কথোপকথন হইয়াছে তাহা হইতে তাঁহার মানসিক জীবনের একখানি ক্রমপরিবর্তমান ধারাবাহিক ইতিহাস সংগৃহীত হইতে পারে। যখন গবাক্ষ-সমীপে স্বামীর সহিত তাঁহার প্রথম সন্দর্শন হয় তখন তাঁহার প্রিয়তমের অন্তরের ন্যায় বাহ্য জগতেও একটা পরিবর্তনের আভাস পরিস্ফুট হইতেছে। শরৎকালের প্রসন্ন নীলাকাশ, মধুর সূর্যালোক, বিকসিত শেফালিকাপুঞ্জ, আসন্ন শিশিরের কুহেলিকারাশিতে ম্লান ও মন্দীভূত হইয়া যাইতেছে। হিমানীপাতে নবোদ্‌গত কমলের ন্যায়, রবিকরসম্পাতে কেতকীকুসুমের পত্রপুটের ন্যায়, তাঁহার হৃদয়নিহিত বিশ্বাসকুসুম অঙ্কুরেই বিদলিত হইতে লাগিল। স্বামী যে তাঁহার প্রতি বিগতস্নেহ এ আশঙ্কা তাঁহার মনে স্থান লাভ করিয়াছে। কবিতার পরবর্তী অংশে এ আশঙ্কা ক্রমেই ঘনীভূত হইয়াছে, কিন্তু এখনও বিশ্বাস একেবারে দূরীভূত হয় নাই। প্রচণ্ড শীত সমাগতপ্রায়, মুক্তবাসা ধরণীর নগ্নশোভা চতুর্দিকে প্রকটিত, কিন্তু তিনি ভাবিলেন তাহাতে তাঁহাদের কোনই কষ্টের কারণ নাই—তাঁহাদের বাহিরে জীবনযাত্রার উপকরণ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান, অন্তর প্রেমালোকে উদ্ভাসিত। বাহিরে শীত ও অন্ধকার, ভয় কি? অন্তরে প্রেমের প্রদীপ জ্বলিতেছে। অন্তরের দীপ বাহিরের অন্ধকার বিদূরিত করিবে, অন্তরের তাপ বাহিরের শৈত্য নিবারণ করিবে। ইহাই ত ঈশ্বরের অভিপ্রায়। ভয় কি? কিন্তু—বলিলে কি হইবে—তবু ত ভয় আসিল, যে আশঙ্কা একবার হৃদয়ক্ষেত্রে প্ররূঢ় হইয়াছে তাহা উপেক্ষা ও ঔদাসীন্যরূপ বারিবর্ষণে সিক্ত হইয়া ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে লাগিল—ইহা এখন আর সে দোলাচল-চিত্তবৃত্তি নহে, ইহা স্থিরতর অবিশ্বাস। ইহার পরে যখন আমরা এই দম্পতীকে সমুদ্র-সৈকতে বিচরণ করিতে দেখিলাম তখন রমণীর জীবনের সন্ধিমুহূর্ত,—কার্লাইলের ভাষার অনুকরণে বলিতে গেলে বলা যায় ইহা meeting-ground of 'Everlasting Yea and Everlasting Nay'—ইহা বিসর্জন

ও প্রতিষ্ঠার সন্ধিস্থল, ইহা উন্নত ও অবনত প্রেমের সন্ধিস্থল, স্বর্গ ও মর্ত্যের মিলনক্ষেত্র। তিনি স্বামীকে বলিতে লাগিলেন—

"এ পরিবর্তন কেন, নাথ? তোমার হৃদয়ের করুণ আহ্বানে আমার হৃদয় সাড়া দিয়াছিল, তুমি যাহা চাহিয়াছিলে আমি ত তাহা দিয়াছিলাম, এ দরিদ্র ভাণ্ডারের সকল ঐশ্বর্য ভক্তিভরে তোমারই চরণ-প্রান্তে অর্পণ করিয়াছিলাম। তুমি ত সবই গ্রহণ করিয়াছ, তবু এ অসন্তোষ কেন, এ ঘৃণা কেন, এ উপেক্ষা কেন? তোমার সকল দোষ, সকল অসম্পূর্ণতা দেখিয়াও তোমার প্রতি আমার ভক্তি ন্যূন হয় নাই। কারণ আমি জানি যাহা সৎ, যাহা মহৎ তাহা যথাসময়ে বিকশিত হইবে, আর তাহারই প্রভাবে যাহা অসৎ, যাহা নীচ তাহার শক্তি ক্ষীণ হইয়া যাইবে। তুমি নিন্দাযোগ্য কি প্রশংসাযোগ্য সে বিচার আমি করি নাই, আমি মনে করিয়াছি দোষগুণনির্বিশেষে—

ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে।

কিন্তু তোমার অন্তরে এ ঘোর পরিবর্তন কেন, নাথ?"

এই ভাব আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে। ইহার পরে আমরা দেখিতে পাই পর্বতের পাদমূলে বসিয়া রমণী একখানি গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। তখন তাঁহার মন একেবারে পরিবর্তিত হইয়াছে, তিনি বুঝিয়াছেন নিরাশা ও বিকার সংসারের নিয়ম এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়। যে গ্রন্থ তিনি পাঠ করিতেছিলেন তাহাতে বিষাদচঞ্চল পবনের উদ্দেশ্যে একটি কবিতা লিখিত ছিল। সমীরণ সন্‌সন্ রবে বহিয়া যাইতেছিল, কবি উহাকে কোনও অজ্ঞাত কারণে উপজাত অন্তর্নিহিত দুঃখের তপ্তশ্বাস বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রমণী এই কবিতা পড়িয়া মনে করিলেন যে কবি যৌবনসুলভ অনভিজ্ঞতা-বশতঃ এখনও দুঃখের শিক্ষার দিক্‌টা দেখিতে পান নাই, কেবলমাত্র নিরাশার দিক্‌টাই তাঁহার নিকটে প্রত্যক্ষ। পবনের এই নিঃশ্বাসধ্বনি প্রকৃত পক্ষে দুঃখের বার্তা নহে পরন্তু আশার বাণী। কিন্তু ইহা তাঁহার মনের কথা, প্রাণের মধ্যে এখনও সব সময়ে ইহার সাড়া পান না। জগতের এই অনন্ত-প্রকার পরিবর্তন-প্রবাহের মধ্যে তাঁহার হৃদয় অজ্ঞাত-বেদনা-ভরে এক একবার কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল, তাঁহার হৃদয়ে কিয়ৎকাল পর্যন্ত আশা ও

নিরাশার সংগ্রাম উপস্থিত হইল, পরে আশা জয়ী হইল—নিরাশা পরাভূত হইল। এইবার তাঁহার জীবনের প্রকৃত পরিবর্ত্তনের সময় আসিয়াছে। এইবার একদিন নির্ম্মল শারদপ্রাতে যখন আমরা তাঁহাকে শৈলান্তরালে দেখিতে পাইলাম তখন তাহার অন্তঃপ্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হইয়াছে—অবসাদ কুয়াসা কাটিয়া গিয়াছে, হৃদয়ের মলিনতা ধৌত হইয়াছে—আত্ম-বিস্মৃতি, উন্নত প্রেম, কর্তব্যপরায়ণতা ক্ষুদ্রপ্রেমের স্থান অধিকার করিয়াছে, প্রতিদানস্পৃহা একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। তারপর শেষ অবস্থা—আত্ম-বিসর্জন। তিনি প্রিয়তমের মনস্তুষ্টি সম্পাদনের নিমিত্ত—বড় কষ্টে নয়নের উদ্গত অশ্রু সংবরণ করিয়া, অসাধারণ আত্মসংযমের সহিত—সোৎসুকনেত্রে একবার শেষ দৃষ্টিপাত করিয়া প্রিয়তমের সান্নিধ্য চিরজীবনের জন্য পরিত্যাগ করিলেন। মর্ত্যলোক স্বর্গধামে পরিণত হইল, আত্মপ্রতিষ্ঠা আত্ম-বিসর্জনে বিলীন হইল, উন্নত প্রেমের জয়-পতাকা উড্ডীন হইল।

আমরা আর তাঁহার কবিতার বিশ্লেষণ করিতে ইচ্ছা করি না। সমালোচক ডসন বলেন যে ইংলণ্ডের গত শতাব্দীর সাহিত্যিক ইতিহাসে কার্লাইল ও রাস্কিনের ন্যায় ব্রাউনিং একজন মহাশিক্ষকরূপে জগতের অর্চনালাভের যোগ্য। রাস্কিনের সহিত অনেক বিষয়ে তাঁহার বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু কার্লাইলের সঙ্গে তাহার অনেক সারূপ্য অনুভূত হয়। তন্মধ্যে প্রধান সাদৃশ্য এই যে উভয়েই মনে করেন মানবাত্মার ক্রমবিকাশ যাহাতে প্রকাশিত হয় নাই তাহার মূল্য অত্যল্প এবং তাহা প্রণিধানের অযোগ্য। সাংসারিক সাফল্যের প্রতি উভয়েরই সমান ঔদাস্য ছিল। কার্লাইল তো কখনও সফলতার দিকে ভুলিয়াও দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নাই। ব্রাউনিংও প্রকারান্তরে তাহাই করিয়াছেন। Heroes and Hero-worship নামক গ্রন্থে কার্লাইল যে দুই জন প্রতিভাবান্ মহাত্মাকে বিদ্যাবীর (men of letters) বলিয়া উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া হৃদয়ের যত্নসঞ্চিত সমুদয় ভক্তি-সম্ভার অর্পণ করিয়াছেন তাঁহাদের কেহই সাংসারিক কৃতকার্যতা লাভ করেন নাই, বীরের ন্যায় তাঁহারা আজীবন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন—দারিদ্র্যের সহিত, দুঃখের সহিত, হীনতার সহিত অনবরত তাঁহাদিগকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে,—সিদ্ধিলাভ তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। গ্যেটে সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাই তাঁহার প্রকৃত বীরত্বের নিদর্শন নহে, রণাঙ্গনে

পরাজিত হইলেও তাঁহার বীরত্বের মাত্রা ন্যূন হইত না। ব্রাউনিংও তাহাই মনে করেন। তাঁহার Rabbi Ben Ezra নামক কবিতাটি এই ভাবের প্রকাশক। অনুষ্ঠিত কর্ম কখনও মনুষ্যের চরিত্রগৌরব অথবা নিগূঢ় মহত্ত্বের একমাত্র অনুমাপক নহে। তিনি বলেন—

All I could never be,
All, men ignored in me
This, I was worth to God, whose
wheel the pitcher shaped.

এই ভীষণ জীবনসংগ্রামের দিনে যখন পদে পদে নৈরাশ্য আসিয়া আক্রমণ করে, যখন সিদ্ধি দুরগম্য বলিয়া মনে হয়, যখন জীবনের স্তূপীকৃত বিফলতা হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করিয়া জীবনকে নীরস ও উৎসাহহীন করিয়া ফেলে, তখন ব্যর্থমনোরথ সাধকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আশার বাণী, ইহা অপেক্ষা মধুরতর আশ্বাসের বর আর কি হইতে পারে? কত নিরুদ্যম হতাশ যুবকের ছায়াচ্ছন্ন হৃদয়ে এই সান্ত্বনাপ্রদ গভীর বাণীতে আশার আলোক উদ্ভাসিত হইবে, কত নিশ্চেষ্ট যাত্রী এই মন্ত্রের অনুপ্রাণনায় নববলে বলীয়ান ও নব আশায় উৎসাহিত হইয়া দুস্তর তরঙ্গসঙ্কুল সংসার-পারাবার উত্তীর্ণ হইতে প্রয়াস করিবে। এইরূপে দুঃখী ও নিরাশের জন্য সর্বত্রই ভাববিভোর কবির সন্তপ্ত নেত্র হইতে অবিরলবাহী অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়াছে। তিনি ও কার্লাইল উভয়েই শিখাইয়াছেন জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বাহিরে কর্তব্যকর্মের সংসাধন এবং হৃদয়ে উন্নত ভাবরাশির পরিপোষণ—সিদ্ধি অথবা সফলতা জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে। "সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা" গীতার এই মহতী উক্তি উভয়েরই প্রচারিত সত্যের একমাত্র আদর্শ। বর্তমান ইংরেজ জাতির মানসিক অবস্থার পর্যালোচনা উপলক্ষ্যে কার্লাইল লিখিয়াছেন—

'What is it, if you pierce through his Cants, his oft-repeated Hearsays, what he calls his Worship and so forth,—what is it that the modern English soul does, in very truth, dread infinitely, and contemplate with entire despair? What is his Hell, after all these reputable

oftrepeated Hearsays, what is it ? With hesitation, with astonishment, I pronounce it to be : The Terror of not succeeding.'*

কামনা অথবা সফলতার আকাঙ্ক্ষা যতক্ষণ মানবের মনে প্রবল থাকিবে ততক্ষণ সুখ তাহার পক্ষে সর্বতোভাবে দুরধিগম্য। কারণ প্রাপ্তিতে সুখ নাই, সুখ চেষ্টা এবং সংগ্রামে ; ভোগে সুখ নাই, সুখ ত্যাগে। প্রাপ্তি এবং ভোগে একটা অবসাদ আসে মাত্র, তাহা কখনই মনুষ্যের কাম্যবস্তু নহে। সুখ—মনের যে ভাবকে সাধারণতঃ সুখ নামে আখ্যাত করা হইয়া থাকে, তাহা—কখনই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য নহে। বিখ্যাত লেখক R. L. Stevenson বলেন—

"Nor is happiness, eternal or temporal, the reward that mankind seeks. Happiness are his wayside campings ; his soul is in the journey ; he was born for the struggle, and only tastes his life in effort and on the condition that he opposed.†

কবিবর রবীন্দ্রনাথও প্রকারান্তরে তাহাই বলিয়াছেন—

অহিফেন-জড় সুখ, কে চায় ইহাকে ?
মানবত্ব এ নয় এ নয়,
রাহুর মতন সুখ গ্রাস করে রাখে
মানবের মানবহৃদয়।
মানবেরে বল দেয় সহস্র বিপদ,
প্রাণ দেয় সহস্র ভাবনা,
দারিদ্র্যে খুঁজিয়া পাই মনের সম্পদ,
শোকে পাই অনন্ত সান্ত্বনা।

* See his Past and Present, p. 125.

† See his letter to Edmund Gosse in "Letters to his family and friends", Vol. II p. 13 14.

ব্রাউনিংএর প্রতি কবিতায় আমাদের কবিবরের এই মহতী বাণী চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে।

পাপ সম্বন্ধেও কার্লাইল ও ব্রাউনিংএর শিক্ষা প্রায় তুল্যভাবাপন্ন এবং এই বিষয়ে উভয়েই নিউমানের ঘোরতর বিরোধী। নিউমান পাপের অস্তিত্ব পর্যন্ত সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি বলিতেন সমগ্র জগৎ প্রলয়-প্লাবনে প্লাবিত হইয়া বিলুপ্ত হইয়া যায় তাহাও শ্রেষ্ঠ, নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া থাকিতে হয় তাহাও স্বীকার্য, তথাপি যেন ভ্রমেও পাপের প্রশ্রয় না দেওয়া হয়। তাঁহার চক্ষে পাপ সর্বদা এবং সর্বথাই ঘৃণিত—মোহন বেশে সজ্জিত থাকিলেও ঘৃণিত, পরিণামে শুভের নিদান হইলেও ঘৃণিত। যাহা বস্তুগত্যা অশুভ তাহা হইতে কখনই প্রকৃত শুভের উৎপত্তি হইতে পারে না, আর হইলেও তাহাতে অশুভের হেয়ত্ব তিরোহিত হয় না। নিউমানের এই শিক্ষা টেনিসন অকুতোভয়ে কিয়দংশে গ্রহণ করিয়া তাঁহার ইন্দ্রজালিক লিপি-শক্তির সহায়তায় জগৎসমক্ষে প্রচারিত করিয়াছেন। এই পাপের সংস্পর্শেই আর্থারের বীর সম্প্রদায়ের (Round Table) মহান্ উদ্দেশ্য বিফল হইল। মানবজাতি অথবা ব্যক্তিবিশেষের প্রকৃত উন্নতি পাপের দ্বারা কখনই সংসাধিত হইতে পারে না—এই তত্ত্ব উজ্জ্বল বর্ণে তাঁহার 'Idylls of the King'-এ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু নিউমানের এই মত তাঁহার সমসাময়িক সকল সুধীবৃন্দের নিকট সমাদৃত হয় নাই। কার্লাইল বজ্রগম্ভীরস্বরে ইহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, ব্রাউনিং এবং হথর্ণ (Hawthorne) ইহার বিরুদ্ধমত মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন। কার্লাইল বলেন—

'ভুল, ভ্রান্তি অথবা পাপের অসদ্ভাব হইতে মনুষ্যের প্রকৃত মহত্ত্ব নির্দ্ধারিত করিবার চেষ্টা করিও না। এরূপ ক্ষুদ্র মানদণ্ড দ্বারা মনুষ্যত্বের নির্ণয় অসম্ভব। কাহার মধ্যে কোন্ কোন্ দোষের অভাব আছে তাহা হইতে নহে, কাহার মধ্যে কোন্ কোন্ গুণের সমাবেশ আছে তাহা হইতেই মানুষের আভ্যন্তরীণ মহত্ত্বের সহিত আমাদের পরিচয় সংঘটিত হয়।'

বলা বাহুল্য, ব্রাউনিংএর শিক্ষাও ঐরূপ। তিনি শিখাইয়াছেন মঙ্গলের বিকাশের জন্যই অমঙ্গলের উপযোগিতা, পাপ পরিণামে পুণ্যের সহায়তা করে। নতুবা মঙ্গলময় ভগবানের বিশ্বরচনায় অমঙ্গল অথবা পাপের আর

কোন অর্থ নাই। ইহাকেই তিনি 'blessedness of evil' বলিয়াছেন। তিনি বলেন—

This world's no blot for us,

Nor blank : it means intensely and means good.

ব্রাউনিংএর দার্শনিকতা ও ধর্ম সম্বন্ধে অনেকে অনেকপ্রকার আলোচনা করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে ধর্মান্দোলন এবং ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক সমালোচনা সমগ্র য়ুরোপখণ্ডকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল তাহার প্রভাব ব্রাউনিং একেবারে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাহার কবিতার কোন কোন স্থলে সমসাময়িক বিবিধ আন্দোলনের স্পন্দন স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারা যায়। ইহাতে সন্দেহ এবং বিশ্বাস, জ্ঞান এবং ভক্তি প্রভৃতি অন্যোন্যবিরুদ্ধ ভাবসমূহের সমাবেশ আছে এবং পরিণামে প্রেম এবং বিশ্বাসের প্রাধান্য কীর্তিত হইয়াছে। তাঁহার প্রচারিত ধর্মমত অনেকের নিকট একটু অভিনব বলিয়া মনে হইতে পারে, বর্তমান ভাবুকগণের নিকট তাহার সকল সিদ্ধান্ত সমভাবে গ্রাহ্য না হইতে পারে, কিন্তু অনাগত ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা তাহার প্রদত্ত শিক্ষাকে উচ্চাঙ্গের শিক্ষা বলিয়া সম্মান করিবে ইহাতে লেশমাত্রও সংশয় নাই। তাঁহার মানবচরিত্রাভিজ্ঞতা, মনোবিজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, নির্ভীক চিন্তাশীলতা এত অসাধারণ যে বিদেশে একমাত্র Balzac ও স্বদেশে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত এ বিষয়ে আধুনিক যুগে তাঁহার সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহ আছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। জটিল মানবান্তঃকরণের ছায়ালোক ও সদসৎ-প্রবৃত্তির ক্রীড়া এত সুকৌশলে, এরূপ নিপুণ তুলিকাস্পর্শে তিনি ব্যতীত আর কয়জনে দেখাইতে পারিয়াছে? তাঁহার কবিতা সমগ্রজীবনের বিভিন্ন অঙ্গের দর্পণস্বরূপ। ইহাতে সৌন্দর্যতটিনীর বিচিত্র তরঙ্গলীলা ভাবকৌমুদীর কোমল স্পর্শে কিরূপ বিলাসভঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা কবির কল্পনা ও চিত্রকরের তুলিকা উভয়েরই উপভোগযোগ্য। কাব্যরসপিপাসু পাঠকবর্গ উহা অনুভব করিলেই বুঝিতে পারিবেন।